ফ্যাসিবাদ ও বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নৈতিকতার সংকট

মেকি মার্কসবাদী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলির চরম সুবিধাবাদী দেউলিয়া রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে দু'টি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। এরপর ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতায় ফিরে এসে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর চরম আক্রমণ চালায় এবং ফ্যাসিবাদ আনার দিকে পদক্ষেপ নেয়। এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই দলের ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশাল জনসমাবেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই ভাষণটি সেই জটিল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে জনসাধারণের কর্তব্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ।

আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের এই জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই জনসভায় বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। তাছাড়া, জনসাধারণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু কর্মী আজকের এই সভায় আলোচনা করবার জন্য ইতিমধ্যেই লিখিতভাবে আমার কাছে অনেক প্রশ্ন রেখেছেন। আমি প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, নানা ধরনের এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর যত প্রশ্ন আজকের এই সভায় আলোচনা করবার জন্য আমাকে করা হয়েছে, তার সবগুলো এই একটা সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়, এবং আমি তা করতেও পারব না। তবে কিছু কিছু প্রশ্ন যেগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে, বর্তমান বামপন্থী আন্দোলনের সমস্যাগুলোর সাথে, বা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর সাথে জড়িত রয়েছে — সেইসব প্রশ্নগুলোকে আমি যতটা সম্ভব আমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

দেশের মূল সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস অক্ষম

প্রথমেই যে কথাটা আমি আপনাদের বলতে চাই, তা হচ্ছে, বাইরে থেকে প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে শাসক সম্প্রদায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তার চেহারার যে নক্সাই আপনাদের সামনে তুলে ধরুক না কেন, বাস্তবে ভারতবর্ষের আসল চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের এবং সত্যিই জটিল। সত্যিই আমরা ভারতবর্ষের জনসাধারণ একটা গুরুতর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি। বর্তমানে আমাদের দেশে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, চরম খাদ্যসংকট এবং খরা পরিস্থিতি ও বন্যাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং ঠিক বর্তমান সময়ে বিদ্যুৎ সংকটকে কেন্দ্র করে যে জটিল সমস্যা শিল্পক্ষেত্রে ও নাগরিকদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে — কংগ্রেসের নানা প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি এবং হাজার বিভ্রান্তিমূলক প্রচার সত্ত্বেও তা আর চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, ইন্দিরার নেতৃত্বে নতুন কংগ্রেসের, যেটা নাকি পুরনো কংগ্রেস থেকে আলাদা, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের স্লোগান এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে নতুন করে যুবশক্তির অভ্যুত্থান দেখে — 'কংগ্রেস আবার একটা নতুন পথ দেখাবে' বলে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের কিছু অংশের মধ্যে কংগ্রেস সম্পর্কে যতটুকু মোহ গড়ে উঠেছিল, রাজনীতির জটিল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে না পারলেও এই বাস্তব সমস্যাগুলোর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মানুষের মনের মধ্যে সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা বুঝতে সক্ষম না হলেও মানুষ এমনিতেই বুঝতে পারছে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি মতো কাজ তো হচ্ছেই না, চেষ্টাটাও ঠিকমতো হচ্ছে না। বড় বড় কথার চাতুরিতে চালাকি করে এবং যতটা সম্ভব প্রচারযন্ত্রকে কুক্ষিগত করে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বাস্তব সমস্যাগুলো যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হাত দেওয়ার কোনও চেষ্টা হচ্ছে না।

যদিও আমাদের মত ভিন্ন রকম। আমরা মনে করি, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চেষ্টা হলেও কিছু ফল হত না। স্বভাবতই, আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মানুষগুলি যদি সৎ হত এবং তারা যদি সত্যি সত্যিই কিছু করতে চাইত, তাহলে কি কিছু তারা করতে পারত না? আমরা মনে করি, যদি সত্যি

সত্যিই কিছু ভাল কাজ গণতন্ত্রের পক্ষে এবং জনকল্যাণের পক্ষে কংগ্রেস করতেও চাইত এবং করবার মতো যদি সংগঠনের মানসিকতা তাদের থাকত, তাহলেও যেটুকু তারা করতে পারত, তা হচ্ছে, দুর্নীতিকে খানিকটা সীমিত করা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে খানিকটা আপেক্ষিক অর্থে নিরপেক্ষ করা, জনমুখী করা অর্থাৎ জনগণের সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল করে তোলা, আর জনসাধারণকে কিছু কিছু রিলিফ দেওয়া। কিন্তু দেশে শিল্পের ক্রমোন্নতি সাধন, অর্থাৎ অপ্রতিহত গতিতে শিল্প বিকাশের দ্বার খুলে দেওয়া, কৃষির বৈজ্ঞানিকীকরণ এবং আধুনিকীকরণ করা এবং ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান করা — যেগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের মূল সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে তার সমাধান তারা ইচ্ছে থাকলেও করতে পারত না।

দেশের অগ্রগতির সামনে মূল সমস্যা

আমি মনে করি, আধুনিক ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধিশালী, উন্নতিশীল এবং একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে, জনসাধারণকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিতে হলে এবং 'গরিবি হঠাও' স্লোগানটাকে বাস্তবীকৃত একটি স্লোগানে পর্যবসিত করতে হলে তিনটি মূল সমস্যায় মাথা ঘামাতে হবে। প্রথমত, দেখতে হবে কী করে কৃষির আধুনিকীকরণ করা যায়, এবং তার ফলে গ্রামে যে মানুষগুলি উদ্বৃত্ত হবে তাদের কাজ দেওয়ার জন্য কী করে বাধাহীন শিল্পোন্নয়নের রাস্তা খুলে দেওয়া যায়, অর্থাৎ ক্রমাগত শিল্পোন্নয়নের রাস্তায় এগোনো যায় এবং এই দুই প্রচেষ্টার মাধ্যমে কী করে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়।

আপনারা জানেন যে, সরকারের পক্ষ থেকে বেকারদের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে এবং তার জন্য নাকি 'সরকারি ক্ষেত্রে কিছু কিছু চাকরিও সৃষ্টি করা হচ্ছে' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে কতদূর কী হয়েছে তা একমাত্র তারাই বলতে পারে। কিন্তু, এই ধরনের প্রচেষ্টা যদি সরকারের পক্ষ থেকে হয়ও, তাহলেও তার দ্বারা দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কতটুকু সমাধান হতে পারে? এর দ্বারা বড় জোর যা হতে পারে, তা হচ্ছে, দল রাখার জন্য, মুখরক্ষার জন্য কিছু কিছু দলীয় যুবকদের কাজ দেওয়া যেতে পারে। যে কাজের জন্য পাঁচজন লোকের প্রয়োজন সেখানে কিছু সরকারি চাকরি সৃষ্টি করে দশজন লোককে বসিয়ে মাইনে দেওয়া যেতে পারে এবং তার দ্বারা একটি মাথাভারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে জনসাধারণের অর্থের চূড়ান্ত অপচয় ঘটানো যেতে পারে। আর একটা হল, স্বাভাবিক নিয়মেই কিছু লোক প্রতি বছর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের ফলে যে পদগুলো খালি হচ্ছে সেই পদগুলিতে সরকার কিছু লোককে চাকরি দিতে পারে। সে তো গভর্নমেন্টের এমনি দেওয়ার ক্ষমতা। ফলে, সেগুলোকেই ঢাকঢোল পিটিয়ে, 'সরকার এতগুলো চাকরি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে' — এই মিথ্যাচারের দরকার কী? আর, তাছাড়া এগুলোর দ্বারা দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কেশাগ্রও স্পর্শ করা যাবে না। সুতরাং, যাঁরা বেকারি বিরোধী সম্মেলন করছেন এবং বেকারদের কাজ দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছেন, অথবা যাঁরা সরকারের গদিতে বসে বেকারদের কাজ দেওয়ার বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাঁদের এই সমস্যার সমাধান করতে হলে যে জায়গাটায় মাথা ঘামাতে হবে, তা হচ্ছে, দেশে কী করে কৃষির আধুনিকীকরণ করা যায় এবং কী করে ক্রমাগত শিল্পোন্নয়নের দ্বার খুলে দেওয়া যায়। আর, এ প্রশ্নের জট ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের চরিত্র, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ক্রমাগত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল বাধা

এই আলোচনার দ্বারা মূল যে জায়গাটার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, তা হচ্ছে, ভারতবর্ষের অনুন্নত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে কৃষিতে আধুনিকীকরণ ও বৈজ্ঞানিকীকরণ করা দরকার। আবার, কৃষিতে আধুনিকীকরণ ও বৈজ্ঞানিকীকরণের কাজে হাত দেওয়াই অসম্ভব যদি না দেশে ক্রমাগত শিল্পোন্নয়নের দ্বার খুলে দেওয়া যায়। তাহলে দেখা যাক, আমাদের দেশে ক্রমাগত শিল্পোন্নয়নের পথে মূল বাধা কী? একদল পণ্ডিত বলবেন, আমাদের দেশে এই শিল্পোন্নয়নের পথে মূল বাধা হচ্ছে পুঁজির অভাব, পুঁজির স্বল্পতা। পুঁজি সংগ্রহের জন্য তাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘোরা হচ্ছে। কিন্তু আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করি, যতটুকু পুঁজি ভারতবর্ষের মাটিতেই গড়ে উঠছে প্রতিদিন, যতটুকু পুঁজি অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে এদেশে সঞ্চিত হচ্ছে তাও অলস হয়ে থাকছে কেন? তা ব্যুরোক্রেটিক হয়ে পড়ছে কেন? শিল্পোন্নয়নে তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না কেন? আমি যদি প্রশ্ন করি যে, এদেশে বর্তমান পুঁজির শক্তির ভিত্তিতে নানা শিল্প

কারখানাগুলিতে যতটুকু উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে তার পরিপূর্ণ ব্যবহার, অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ নিয়োগ করতে পারা যাচ্ছে না কেন উৎপাদনে? কোনও কলে-কারখানায় ধর্মঘট হলেই 'উৎপাদনের এতগুলো দিন নষ্ট হয়ে গেল' বলে সরকার এবং মালিকশ্রেণী চিৎকার শুরু করে দেয়। কিন্তু যখন ধর্মঘট থাকে না, যখন শিল্পে শান্তিপূর্ণ অবস্থা থাকে তখনও সবসময় যে উৎপাদিকা শক্তি দুর্গাপুরে, রাউরকেল্লায় বা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোকে কেন্দ্র করে রয়েছে তার সম্পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে কি? তাকে পুরোপুরি তারা কাজে লাগাতে পারছে কি? তখনও সবসময় সে পুরোপুরি উৎপাদন দিতে পারে কি? যদি না পারে তাহলে ধর্মঘট তো তার জন্য দায়ী নয়, বা পুঁজির অভাব তো তার জন্য দায়ী নয়। তাহলে কী সেই কারণ যা এই অবস্থার জন্য দায়ী সেই প্রশ্নটাকে খুঁজে বের করতে হবে। যদি সাহস থাকে নেতৃত্ব দেওয়ার, সখ নয়, নেতৃত্ব দেওয়ার সত্যিকারের স্পর্ধা যদি থাকে মানুষের মতো, তাহলে মানুষের মতো এই প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে। কী সেই বাধা যার জন্য যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি দেশের মধ্যে রয়েছে তাও সবসময় পুরোপুরি ব্যবহার করা যাচ্ছে না? আসলে ঐ বাধার মূল কারণ হচ্ছে ভারতের পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক। মনে রাখা দরকার, এক একটা সমাজ গড়ে ওঠে এক একটা উৎপাদন-সম্পর্ককে ভিত্তি করে। আবার এক একটা সমাজ কিছু দিন চলতে চলতে সেই বিশেষ উৎপাদন-সম্পর্কটি অকার্যকরী হয়ে যায়। উৎপাদনের বিকাশের পথে তখন সেই বিশেষ উৎপাদন-সম্পর্ক বাধা হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। তখনই দেখা দেয় উৎপাদন-সম্পর্ককে পাল্টাবার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন। সমাজের নতুন প্রয়োজনে, নতুন তাগিদে, নতুন উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন। ফলে, আমরা যখন ভারতবর্ষের বিপ্লবের কথা বলি, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বিরুদ্ধে কথা বলি তখন সেটা একটা রাজনৈতিক চালাকি নয়।

আজ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা হুজুগে কাজ করছেন, যাঁদের মধ্যে তারুণ্য রয়েছে, দেশকে যাঁরা সত্যিই ভালবাসেন তাঁরা বিভ্রান্ত হতে পারেন। তাঁদের কাছে আমার একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁরা ভেবে দেখবেন, যাকে তাঁরা সমাজবাদ বলেন সেটা কী জিনিস? পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাতেই সমাজবাদের ধারণা জন্ম নিচ্ছে কেন? এবং সমাজবাদ এই কথাটার দ্বারা তাঁরা কী বোঝাতে চান? তাঁদের বক্তব্য এবং আচরণ থেকে যে ধারণাটা ফুটে উঠছে, তা হচ্ছে, তাঁরা সমাজবাদ বলতে মনে করেন, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক যাকে আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বলি — সমাজবাদ এলেও সেটা ঠিকই থাকে। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক যাকে মালিক-মজুর সম্পর্ক বলা হয় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সে সবই সমাজে ঠিক থাকবে, অথচ তাঁরা সমাজবাদ নিয়ে আসবেন। এমন কথা যদি শিক্ষিত হয়ে তাঁরা বলেন তাহলে দু'টি মাত্র তার সম্ভাবনা থাকতে পারে। একটি হল, হয় তাঁরা জেনে বুঝে মিথ্যা কথা বলছেন, সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছেন। আর না হয়, সমাজতন্ত্র কী তাই তাঁরা জানেন না। পুঁজিবাদ কাকে বলে তাও জানেন না। তাঁরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন, একচেটে পুঁজি ধ্বংস করার জন্য বক্তৃতা করেন, অথচ পুঁজিবাদ কী সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নেই। তাঁরা মনে করেন, কতকগুলো পুঁজিপতির গলা টিপে ধরা মানেই পুঁজিবাদকে খতম করা। না, কয়েকজন পুঁজিপতিকে খতম করলেই পুঁজিবাদ খতম হয় না। সমাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকলে ঐ পুঁজিপতিদের জায়গায় আরও কতকগুলি পুঁজিপতি আসে। পুঁজিবাদ খতম করার সংগ্রাম হচ্ছে, পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করার সংগ্রাম এবং এ কাজটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সাধন না করে করা অসম্ভব। ফলে, যাঁরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা বলছেন, তাঁরা যে একচেটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলছেন, সে কথা আমি জানি। কিন্তু আমার প্রশ্ন সেখানে নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক আজ বাধা হিসাবে কাজ করছে, নাকি এখনও তার প্রগতিশীল ভূমিকা আছে — সেকথা তাঁরা ভেবে দেখেছেন কিনা। তাঁরা ভেবে দেখেছেন কিনা, ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের সামনে পুঁজি সংগ্রহই প্রধান সমস্যা, নাকি উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত করার সমস্যাই প্রধান এবং মূল সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

কৃষিতে আধুনিকীকরণের সমস্যা

এবারে আমাদের দেশে কৃষিতে আধুনিকীকরণের সমস্যাটির কথা ধরা যাক। একথা সকলেই জানেন,

অর্থনীতিগতভাবে কোনও দেশ অগ্রসর, কি পশ্চাৎপদ তা নির্ধারিত হয় সেই দেশের জনসংখ্যার কতটা অংশ কৃষি অর্থনীতিতে এবং কতটা অংশ শিল্পে নিয়োজিত তার তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত একটা দেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষি অর্থনীতিতে আটকে থাকে ততক্ষণ সে দেশের অনুন্নত অবস্থা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। তাহলে, একথা সকলেই স্বীকার করবেন, আমাদের দেশকে পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে হলে কৃষির আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। অথচ আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কৃষিতে সামগ্রিকভাবে আধুনিকীকরণের জন্য কোনও প্রচেষ্টা হয়নি। কেন হয়নি? কৃষিতে আধুনিকীকরণ করার ক্ষেত্রে শাসক সম্প্রদায়ের কী অসুবিধে, সে কথা কি যুব সম্প্রদায় ভেবে দেখেছেন? এ ব্যাপারে বিশদ তত্ত্ব আলোচনা না করে সোজা একটা কথা তাঁদের বোঝবার জন্য আমি তুলে ধরছি। আমাদের দেশের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শহরের কলকারখানাগুলোর ক্রমোন্নতি না হওয়ার ফলে এবং নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠবার প্রবণতা মরে যাওয়ার ফলে শহরাঞ্চলে এমনিতেই বেকার বৃদ্ধি হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামের মানুষ ক্রমাগত ভূমিহীন হওয়ার ফলে এবং খেতমজুরদের বছরে তিন মাসের বেশি কাজ থাকে না বলে এবং খেতে পায় না বলে গ্রামছাড়া হচ্ছে দিনের পর দিন। এরকম অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে মানুষ কাজের অন্বেষণে শহরে আসছে এবং গ্রামীণ বেকাররা এসে স্বাভাবিকভাবেই শহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যাকে আরও বাড়াচ্ছে। এমতাবস্থায়, গ্রামীণ অর্থনীতির আধুনিকীকরণ করলে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস চালু করলে এক ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ লোক যারা আজও গ্রামে চাষবাসের মধ্যে আটকে আছে, তারা বেকার হয়ে পড়বে। সেই লোকগুলোকে শহরে কাজ দেবে কোথায়? তাই ক্রমাগত শিল্প বিকাশের দরজা খুলে দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে কৃষিতেও আধুনিকীকরণ করা যাবে না। আর, তা করার ক্ষমতা নেই বলেই শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে গ্রামে ল্যান্ড সিলিং (জমির সর্বোচ্চ সীমা) নির্ধারণ এবং অল্প অল্প কিছু জমি বন্টন করার পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতেই বেশিরভাগ মানুষকে আটকে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। এবং এরই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতিতে চলছে টোটকা, কবিরাজি আর হেকিমি। অর্থাৎ খন্ড খন্ড জমিতে চাষ এবং সার দিয়ে ঐ খন্ড খন্ড জমির মধ্যেই কত রকমের ফসলের যাদু খেলানো যায়, তার সব পরিকল্পনায় কমিশন আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। যদিও আমরা জানি, গ্রামীণ অর্থনীতিতে টোটকা ও হেকিমির এই প্রচেষ্টাগুলিও কংগ্রেস সংগঠনের দুর্বলতা এবং প্রশাসন যন্ত্রের দুর্নীতির জন্য তেমনভাবে তারা কার্যকর করতে পারছে না। কিন্তু, এত করেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। কারণ, আমি আগেই বলেছি, সমস্যার আসল সমাধান করতে হলে কৃষিতে আধুনিকীকরণ করতে হবে এবং তার জন্য শিল্পের অগ্রগতির দ্বার খুলে দিতে হবে। অথচ আমাদের দেশে শিল্পের অগ্রগতির পথে বাধা কী? প্রথমত, আমাদের দেশে পুঁজিবাদী সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হয় বলে, অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন হয় বলে মজুররা, যারা কলে-কারখানায় কাজ করে তারাও ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গে রয়েছে শহরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বেকার এবং অর্ধবেকার, যাদেরও কোন আয় নেই। ফলে, এমনিতেই শহরাঞ্চলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামে ভূমি সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য, উন্নত জীবনযাত্রা না থাকার জন্য, যারা গ্রামে বাস করে তার শতকরা পঁচাত্তর জন অর্ধভুক্ত অবস্থায় অমানুষের মতো দিনযাপন করে। এমতাবস্থায় একটা দেশে জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোক যেখানে গ্রামে বাস করে এবং সেই বিপুল গ্রামীণ জনসংখ্যার আবার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকেরই যেখানে প্রায় কেনবার ক্ষমতাই নেই, শহরের মধ্যেও বেকার-অর্ধবেকারে ভর্তি, কলে-কারখানায় যে মজুররা কাজ করে তাদেরও মোটামুটি কোনওমতে দু'বেলা খেতে আর কোনওমতে একটি সংসার প্রতিপালন করতেই সর্বস্ব চলে যায় — এইরকম দেশে বাজার, অর্থাৎ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য কেনবার লোক কোথায়? আর, বাজার না থাকলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় না। কারণ, পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। তাই এইরকম দেশে সাবসিডি দিলেই, লাইসেন্স-পারমিট দিলেই হু হু করে কলকারখানা গড়ে উঠতে পারে না এবং যে কলকারখানাগুলো চালু থাকে সেগুলোও তাদের যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি আছে সবসময় তার পুরো সদ্ব্যবহার করতে পারে না। ফলে, এইসব প্রচেষ্টায় একদিকে যেমন কিছু কিছু কলকারখানা গড়ে ওঠে, আরেকদিকে গড়ে-ওঠা কলকারখানাগুলি লালবাতি জ্বালাতে থাকে। পুঁজিপতিরা এসব কথা মানতে চায় না। তারা কোনওদিন মানবেও না। তারা এসব তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। তারা সামন্ততন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে বুঝত, কিন্তু পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কী — তা তারা বুঝতে চায় না। কিন্তু যাঁরা সমাজবাদের ভড়ং করেন, সমাজবাদের কথা বলেন, তাঁদের তো এসব কথা বুঝতে

হবে। তাহলে শাসক কংগ্রেস দলের নেতারা, যাঁরা সমাজতন্ত্র আনবেন এবং ধীরে ধীরে আনছেন বলে চিৎকার করছেন, তাঁরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈজ্ঞানিকীকরণের জন্য এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করার জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? না, সে রাস্তায় তাঁরা পা দিচ্ছেন না। কারণ, বিপ্লবের আঘাতে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে পাল্টে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে না পারলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করা সম্ভব নয় এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতেও আধুনিকীকরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এঁরা এরূপ বিপ্লবকে ভয় পান। তাই দেখা যাচ্ছে, তাঁরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের নামে বাস্তবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থারই সেবা করে চলেছেন এবং কৃষি সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রেও তাই মূলে আঘাত করার বদলে কবিরাজি টোটকা করার পথ ধরেছেন। তাঁদের সমাজতন্ত্রের উৎপাদন-সম্পর্ক পুঁজিবাদীই থাকছে, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্কই থাকছে, আর অন্যদিকে কিছু ব্যবসা, কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করে, যার দ্বারা মালিক-মজুর সম্পর্কের কোনও পরিবর্তনই সাধন হচ্ছে না, সেগুলোকেই তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সমাজতন্ত্র বলে চালাচ্ছেন।

সামাজিক মালিকানা ও রাষ্ট্রীয়করণ এক জিনিস নয়

এ ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। তাই আমি বেশি কথা বলব না। কিন্তু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং ছাত্র ও যুবসমাজকে শুধু একটা কথা আমি ভেবে দেখতে বলি। সোস্যাল ওনারশিপ (সামাজিক মালিকানা), আর জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা সবসময় এক জিনিস নয়। রাষ্ট্রীয়করণ সমাজবাদের একটা অঙ্গ ঠিকই। কিন্তু তার আগে যে কাজটি করতে হয়, তা হচ্ছে, বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পাল্টে ফেলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারা গণতন্ত্র, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এবং এইভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গোটা অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হলেই রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা যথার্থ অর্থে সামাজিক মালিকানা প্রবর্তন করা সম্ভব। ফলে, 'জাতীয়করণ হলেই, শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই সমাজবাদের ভিত্তি স্থাপন হয়' — অর্থনীতি এবং ইতিহাসের কোনও ছাত্র একথা বলতে পারে না। যাদের সামনে হিটলারের ইতিহাস রয়েছে, ফ্যাসিস্ট জার্মানির ইতিহাস রয়েছে, যাদের সামনে মুসোলিনির, ইটালির ফ্যাসিবাদের ইতিহাস রয়েছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে, জাতীয়করণ এবং শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা সেই সব দেশে সমাজবাদের জমি তৈরি হয়নি, হয়েছিল জঘন্য নাৎসিবাদ এবং ফ্যাসিবাদ। ঐ যুব কংগ্রেসিদের সাধনার ব্যক্তি যিনি জহরলাল, সেই জহরলালই একদিন বলেছিলেন, ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ হচ্ছে মানবতার চরম শত্রু। মানবতার সেই চরম শত্রুদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানবতার সবচেয়ে ঘৃণ্য মতবাদ, প্রগতির সবচেয়ে বড় শত্রুতাসাধনকারী ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছিল সেদিন জার্মানিতে ও ইটালিতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয়করণ হলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তা হচ্ছে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র। রাষ্ট্রের চরিত্র যদি পুঁজিবাদী হয় এবং উৎপাদনের সম্পর্ক যদি পুঁজিবাদী সম্পর্ক, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্কই থাকে, সেখানে রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা পুঁজিবাদের এগ্রিগেট ইন্টারেস্ট (সামগ্রিক স্বার্থ) রক্ষা করার প্রচেষ্টা বুঝিয়ে থাকে, যার সাথে সমাজবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ তার দ্বারা দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ ইতিহাসের এই জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে মজুত থাকা সত্ত্বেও আজ আবার আমাদের দেশে যেভাবে ছাত্র, যুবসম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প দেখে তাকেই সমাজতন্ত্র ভেবে বিভ্রান্ত হচ্ছেন তা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। প্রসঙ্গত, এইখানে একটি ঘটনার কথা আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একদিন ইটালিতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প দেখে এবং তার সাথে সাথে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক কল্যাণমূলক কিছু ব্যবস্থা দেখে তার জয়গান গাইতে শুরু করেছিলেন ইউরোপে। আমি সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু রমাঁ রলাঁ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, তিনি যাকে প্রগতি বলছেন তা মানব সভ্যতার সঙ্গে চরম দুশমনি করবার ষড়যন্ত্র মাত্র। সমাজবাদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর সম্বিত এল। কারণ, মানুষটা বড় ছিলেন। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের এই একাংশের মধ্যে সেই জিনিসটা নেই। তাঁদের

চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তাঁরা জিলিপির প্যাঁচের মতো 'কেন হবে না' বলে শুধু প্যাঁচাতে থাকবেন। আমি বলি, হলে ভাল। কিন্তু হওয়ার একটা রীতি আছে।

সমাজবাদ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা

আপনাদের মনে রাখা দরকার, সমাজবাদ কেউ পকেটে তৈরি করতে পারে না, বা কারোর মস্তিষ্কের ফর্মূলা দিয়েও তা তৈরি হয় না। যে কারণে মানুষ যত বড় হোক না কেন, শুধুমাত্র তার কল্পনা বা মানুষের কল্যাণ চিন্তা থেকেই সমাজবাদের চিন্তা আসেনি। তা যদি হত, তাহলে হজরত মহম্মদের মাথায় সমাজতন্ত্রের চিন্তা আসত, যিশুখ্রিস্টের মাথায় সমাজতন্ত্রের চিন্তা আসত, চৈতন্যের মাথায়, শঙ্করাচার্যের মাথায়, বুদ্ধের মাথায়, কনফুসিয়াসের মাথায় সমাজতন্ত্রের চিন্তা আসত। এঁরা সকলেই মানবকল্যাণের জন্য সর্বস্ব দিয়ে লড়ে গেছেন তদানীন্তন সময়ের সমস্ত রকম সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, কিন্তু তার দ্বারা তাঁরা সমাজবাদের চিন্তার জন্ম দিতে পারেননি। অথচ পরবর্তী যুগে পুঁজিবাদ আসার পর, পুঁজিবাদী শোষণ অত্যাচার শুরু হওয়ার পর তাঁদের মতো অত বিরাট মানুষ না হওয়া সত্ত্বেও আজকের সমাজে কত সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কেও সমাজবাদের চিন্তা এসে দেখা দিয়েছে, দেশে দেশে সমাজবাদের চিন্তার স্ফূরণ হয়েছে। দর্শনের জটিল কথার মধ্যে আমি যেতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, কোনও চিন্তা মানুষ যখন প্রতিফলিত করে সেই চিন্তা হচ্ছে সমাজচিন্তা। সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার খাদ্য সংগ্রহ হয় এবং হয়ে তা ডালপালা নিয়ে একটা স্ট্রাকচার (কাঠামো) গ্রহণ করে। তারপর সেই চিন্তাই ব্যক্তির উপলব্ধি অনুযায়ী ব্যক্তিচিন্তা হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে। কাজেই কোনও ব্যক্তি স্থান, কাল, পরিবেশের ঊর্ধ্বে নয়। এইজন্যই আমরা দেখতে পাই, সমাজতন্ত্রের চিন্তা, তা সে কাল্পনিক বা বৈজ্ঞানিক যাই হোক, তার স্ফূরণ ঘটেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ইর্‌রিকনসিলেবল কন্ট্রাডিকশন (অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব) থেকে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মজুর-মালিক উৎপাদন-সম্পর্ক আর উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে যে নিয়ত দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব চলতে চলতে যখন ইর্‌রিকনসিলেবল (মীমাংসার অসাধ্য) হয়ে পড়ল, আর যখন আপস সম্ভব নয়, আর যখন সে প্রগতিতে সাহায্য করতে পারে না, তখনই মানুষের মগজে এসেছে সর্বহারা বিপ্লবের চিন্তা, সমাজতন্ত্রের চিন্তা। তা নিয়ে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র কোন রাস্তায় হবে এবং সমাজতন্ত্রের ধাঁচা কী হবে — এ নিয়ে লড়ালড়ি, মারামারি অনেক হয়েছে। এবং বহু লড়ে-টড়ে সমাজতন্ত্রের একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিহাস লক্ষ করলেও দেখা যাবে যে, সমাজতন্ত্রের এই নামাবলী গায়ে দিতে পুঁজিবাদী দেশে একটা দুটো দল চেষ্টা করেনি। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যারা ভাঙেনি, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে বিপ্লবের আঘাতে যারা উৎপাদনকে মুক্ত করতে চায়নি, তারা সমাজতন্ত্রের যত ফর্মুলা নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুক না কেন, শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের মন্ত্র জপতে জপতে তারা সংহত করেছে পুঁজিবাদকে এবং সংহত করে গড়ে তুলেছে ফ্যাসিবাদকে। ইংল্যান্ডে গ্রুপের পর গ্রুপ রাজনৈতিক দল করেছে। লেবার পার্টি থেকে আরম্ভ করে বহু গ্রুপ নানান সময়ে সমাজতন্ত্রের নানা ফর্মুলা নিয়ে এসেছে। ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট-রা নিয়ে এসেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকেই তারা সকলে সার্ভ (সেবা) করেছে। তারা লগ্নিপুঁজিকেই শক্তিশালী করেছে এবং পুঁজিবাদকেই সংহত হতে সাহায্য করেছে। তাদের দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি। যেখানেই পুঁজিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী-সম্পর্ক থেকে উৎপাদনকে মুক্ত করে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্য থেকে উৎপাদনকে মুক্ত করে তা করতে হয়েছে। তারপর সেই সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্বন্ধে আজ যার যাই বক্তব্য থাকুকনা কেন, পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বের গলদের জন্য কোনও কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ যে ভুলই করুক না কেন, এ সত্য তো ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাবে না যে, বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে যারা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল, মজুর-চাষীকে মুক্তি দিয়েছিল, জনগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতেই তা করেছিল। পুঁজিবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে তারা একটা নতুন উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ খাড়া করেছিল। তারা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদে'র জোচ্চুরির দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেনি।

একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ফাঁকা স্লোগান

যাঁরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা বলছেন, একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন, তাঁদের একচেটে

পুঁজির বিরুদ্ধে স্লোগানগুলো, লড়াই করার কথাগুলো তথাকথিত প্রগতির স্লোগানের আড়ালে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার একটা চাল মাত্র। এঁরা যে সিরিয়াসলি তা মিন (মনে) করেন না তা একটা সাধারণ ঘটনা দিয়ে আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। আমাদের দেশে পুলিশি ব্যবস্থায় সেই ঔপনিবেশিক পুলিশি ব্যবস্থার রীতিনীতিগুলি আজও চালু রয়েছে। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বামপন্থীরা যখন গভর্নমেন্টে এসেছে, আমি আপনাদের কাছে এখানে খোলাখুলি বলব, বারবার আমাদের দলের মাধ্যমে আমি নানা নেতাকে এইটে বলবার চেষ্টা করেছি যে, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে তাঁরা বেশি কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের পুলিশের আচার-আচরণে যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পুলিশি অভ্যাসগুলি আজও চালু রয়েছে সেই অভ্যাস ও আচরণগুলো তাঁরা অন্তত পাল্টাবার চেষ্টা করুন, যেগুলো একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যেও পাল্টানো সম্ভব। একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকাও, তাকে আমরা বুচার (কসাই) বলি, একটা পুঁজিবাদী দেশ ব্রিটেনও, কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে, নাগরিকদের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করে তা আর কোথাও নেই। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে নায়েবদের সঙ্গে, জমিদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে পুলিশ আইনের রক্ষক হয়ে যেভাবে নিজেরা আইনকে পায়ে মাড়িয়ে যেত সেই ঐতিহ্য আজও বজায় রয়েছে, বরঞ্চ আরও বেড়েছে। আমাদের দেশে জাস্টিস মোল্লার মতো লোককে মাথায় করে নাচেনি দেশের লোক, নাচছে ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে! জাস্টিস মোল্লা তার একটি রায়ে বলেছিলেন, 'আমি পুলিশকে জানি, তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন একত্রে কাজ করেছি। আমি দেখেছি, আইনের রক্ষক হয়ে তারা কীভাবে স্পষ্ট নিজেরা আইনকে পায়ে মাড়িয়ে যায়। মিথ্যা মামলায় মানুষকে হয়রানি করে।' অর্থাৎ যাঁরা আইন রক্ষা করবেন তাঁরা নিজেরাই আইনের মাথায় পা দিয়ে বসে আছেন। চব্বিশ ঘণ্টা লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা চার্জ দিচ্ছেন। প্রেস-এর লোকেরাও জানেন এবং রাজনৈতিক নেতারাও জানেন যে, থানায় বসে কীভাবে কাজ হয়। আগে কাউকে ধরে, তারপর কী ধারা তার বিরুদ্ধে দেওয়া যায় যাতে সে জামিন পর্যন্ত না পেতে পারে তা ঠিক করে। মানে, সে কী দোষ করেছে তা দেখার দরকার নেই। তার ভিত্তিতে তাকে ধরা হয় না এবং চার্জও তৈরি করা হয় না। কী ধারা তার বিরুদ্ধে দিলে সে জামিন পাবে না এবং বেরোতে পারবে না সেটা থানায় বসে বানানো হয় এবং তারাই আইনের রক্ষক। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে জহরলাল থেকে শুরু করে কংগ্রেসের নেতারা গণতন্ত্র সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। অথচ একটা সাধারণ কথা, একটা দেশের প্রশাসন, বিশেষ করে তার প্রধান অঙ্গ পুলিশ, তার যদি ডিসেন্সি (ভদ্র আচরণ) না থাকে, আইন সম্বন্ধে গুরুতর উদ্বেগ না থাকে, আপেক্ষিক অর্থে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, যদি জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সে পরিচালিত না হয়, তাহলে দেশে গণতন্ত্রটা থাকবে কোথায়? শুধু নেতাদের বক্তৃতায়? অথবা ভোটের সময় কতকগুলো মেঠো বক্তৃতা করার মধ্য দিয়ে? এই করে গণতন্ত্র একটা দেশে টিকে থাকে নাকি? সমাজতন্ত্রের কথা থাকুক, অন্তত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে কয়েকটি বুনিয়াদি জিনিস, তার ন্যূনতম কাজটুকু গত ছাব্বিশ বছরে হয়েছে কি? কংগ্রেস মানুষকে খেতে দিতে পারেনি, অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারেনি। সে পুঁজিপতিশ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর দল। এ কাজগুলো তার দ্বারা করা সম্ভব নয়। সে সমাজবাদ বোঝে না এবং এ কাজ সে পারবে না। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা তো নিজেদের সৎ মানুষ এবং গণতন্ত্রী বলে দাবি করেন। বুর্জোয়া হলেও তো তাঁরা গণতন্ত্রী। তাহলে দেশের পুলিশ, যাদের তাঁরা আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক করে বসে আছেন তারা প্রতিদিন কীভাবে আইনকে পদদলিত করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, সৎ এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁদের বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা থাকলে এ জিনিস তো তাঁদের লক্ষ করা উচিত। কিন্তু তা হচ্ছে না। বরঞ্চ, লোককে ধরে এনে গুঁতো দেওয়া এবং পেটানো যে পুলিশের একটা নিত্যনৈমিত্তিক রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে সেই পুলিশের যদি বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, তার বিরুদ্ধে জনসাধারণ থেকে প্রতিবাদ উঠছে, তখনও তাকে সমর্থন করাই হচ্ছে কংগ্রেসি নেতাদের একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ক্রুপল (প্রশাসনিক সততা)! তাঁদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ক্রুপল এ নয় যে, একজন দায়িত্বশীল অফিসার যদি একটা ক্ষেত্রেও আইন লঙ্ঘন করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে তো একটা দেশের প্রশাসন নিরপেক্ষ হবে। কিন্তু কংগ্রেসি নেতারা তা করেন না। তাঁদের আচরণ হচ্ছে, পুলিশ যতই আইন লঙ্ঘন করুক, যে কোনও উপায়ে তাকে সমর্থন করা। আর, যদি তার পক্ষ সমর্থন করতে একান্তই কোনও সময় খুব অসুবিধে দেখা দেয়, তাহলে 'এরকম একটা ম্যাসিভ (বৃহৎ) ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি হয়ই' — এইসব যুক্তির আড়ালে ভদ্রলোকের মতো বড় জোর একটু ক্ষমা চাওয়া। এই তাঁদের রীতি।

তাহলে, যে একচেটে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে স্লোগান লিখে তাঁরা দেওয়াল শেষ করে ফেললেন, তাঁরা আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। তাঁদের যে শাসনে পুলিশ সাধারণ মানুষগুলোকে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীগুলোকে ধরে আর পেটায় এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে, তাদের বিরুদ্ধে চার্জ যদি নাও টেকে তাহলেও কিছুদিন থানায় আটকে রেখে রুলের গুঁতো দেয়, আইনকে পরোয়া না করে আবার একটা মিথ্যা মামলায় ফাঁসায় এবং এইভাবে হয়রানি করে; তাঁদের সেই শাসনে তাঁরা কয়টা একচেটে পুঁজিপতিকে, আইনে যদি নাও ধরতে পারেন, অনুরূপ কায়দায় হয়রানি করেছেন? যে একচেটে পুঁজিপতি, কালোবাজারি, মজুতদাররা সমাজজীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে, যাদের জন্য সারা দেশ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, যারা এমনকী 'কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করছে' বলে কংগ্রেসি নেতারা ন্যাকামো করছে, তাদের ক'জনকে তাঁরা এই কায়দায় হয়রানি করেছেন? তাহলে বুঝতাম তাঁরা পুরুষ! আসলে এঁরা কাপুরুষ, মুখে শুধু বড় বড় বক্তৃতা। যে সাধারণ মানুষগুলোর কোমরে জোর নেই, যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীগুলোর কোনও রকমের কোনও সহায়সম্বল নেই, ক্ষমতা হাতে পেয়ে পুলিশ এবং সশস্ত্রবাহিনী দিয়ে তাদের উপর বীরত্ব ফলাতে তাঁদের নীতি, আদর্শবোধে কোথাও আটকায় না। অথচ, তাঁদের যত উদারতা, যত গণতান্ত্রিক সহনশীলতা হচ্ছে একচেটে পুঁজিপতি, মুনাফাখোর, মজুতদারদের ক্ষেত্রে। এঁরাই নাকি মানুষ? আর এঁরাই রক্ষা করবেন গণতন্ত্র আর দেশে প্রতিষ্ঠা করবেন সমাজতন্ত্র ? আসলে ইন্দিরাজির নব কংগ্রেসও হচ্ছে নতুন কায়দায় সেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থারই তল্পীবাহক। ফলে, এই একচেটে পুঁজিপতিদের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই। নাহলে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুলিশের এইরূপ নীতিহীন আচরণ কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সমর্থন করতে পারে না। আর, এর জন্য কমিউনিস্ট হওয়ারও দরকার হয় না। কিন্তু তবুও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে যেভাবে তাঁরা হয়রানি করেন, সেইভাবেই একচেটে পুঁজিপতিদের, মজুতদারদের যদি তাঁরা ধরতেন, আবার জামিনে খালাস হয়ে এলে আবার ধরতেন, আবার খালাস হয়ে এলে আবার ধরে নিয়ে পেটাতেন, তাহলে রীতিটা বে-আইনি হলেও তা একটা বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূলে যেত। তাহলে অন্তত এটুকু বুঝতাম যে, এঁরা পুঁজিবাদ খতম করে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করতে পারুন আর না পারুন অন্তত একচেটে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এঁরা যে চিৎকার করেন তার মধ্যে খানিকটা সততা রয়েছে। আর আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায়, তাঁরাও অদ্ভুত! তাঁরা কি একবারও চিন্তা করছেন যে, এই মানুষগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের! চিন্তাভাবনা, যুক্তিবিজ্ঞানের চর্চা — গোটা দেশ থেকে উবে যাচ্ছে। ফলে সমাজজীবনে এই যুক্তিহীন মানসিকতা ও অন্ধ আনুগত্যের ঝোঁক সর্বনাশা ফ্যাসিবাদেরই জমি তৈরি করছে। যে সমস্ত যুবকরা কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন, আমার উপরোক্ত কথাগুলো তাঁদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

ফ্যাসিবাদের স্বরূপ

এখন, এই ফ্যাসিবাদ কী — এটাকে ভাল করে বুঝতে হবে। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমাদের দলের একটা বক্তব্য আমরা সেই ১৯৪৯ সাল থেকে বারবার বলে আসছি। একদল লোক আছেন, যাঁরা প্রশাসনের উগ্র মূর্তিটাকেই ফ্যাসিবাদ বলেন, একনায়কত্বকেই ফ্যাসিবাদ বলেন। মনে রাখা দরকার একনায়কত্ব — মিলিটারি একনায়কত্ব হয়, একনায়কত্ব 'ক্যু'র (আচমকা অভ্যুত্থানের) দ্বারাও তৈরি হয়। তাছাড়া, অত্যাচার সমস্ত জনস্বার্থবিরোধী প্রশাসন ব্যবস্থাতেই হয়, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীরা করে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ তার চেয়ে দুর্ধর্ষ। শুধু অত্যাচার একটা দেশের এত ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটি সর্বাত্মক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। একদিকে সে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে মেরে দিয়ে তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, মানুষের জ্ঞানবিদ্যাবুদ্ধিকে কারিগরিমুখী করে তোলে, অর্থাৎ দেশে একদল টেকনোক্র্যাট (শিক্ষিত কারিগর) সৃষ্টি করে — যারা মানবিক লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত, মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি যাদের কোনও দায়িত্ববোধ নেই, যারা চাকরিকে এবং গোলামিকেই সর্বস্ব বলে মনে করে, পয়সার বিনিময়ে তারা যা কিছু করতে পারে এবং এইভাবে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিদ্যাকে তারা প্রবাহিত করে। অপরদিকে যত অধ্যাত্মবাদ, সেকেলে যত রকমের কুসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা এবং অন্ধতাকে গড়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এরকম ঘটনা যখন দেশে ঘটে তখন যুক্তিবাদী মন দেশে মরে যায়। তাই বামপন্থী

আন্দোলন সম্পর্কেও আমি হুঁশিয়ার করে বলেছিলাম, যে বামপন্থীরা শক্তিবৃদ্ধির জন্য আলাপ-আলোচনার দ্বার বন্ধ করে দিয়ে গায়ের জোর প্রয়োগ করার নীতি গ্রহণ করে, যেহেতু তাদের শক্তি এবং দলবল বেশি বলে তা তখনকার মতো ডিভিডেন্ড (সুবিধা) দেয়; তারা কাউকে মুখ খুলতে দেয় না, কোনও যুক্তিতে কর্ণপাত করে না, তাদের কর্মীরা নিজেরা যুক্তি করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং অপর মানুষের মধ্যেও এই মানসিকতা নষ্ট করে দেয় — তারা কি জানে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া কী? অসম্ভব মনে হলেও বাস্তব সত্য এই যে, যারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, যারা কমিউনিজমের কথা বলছে, যারা বামপন্থার কথা, সংগ্রাম-বিপ্লবের কথা বলছে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে, তারাই আবার তাদের আচার-আচরণের দ্বারা এমন একটা যুক্তিহীন মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করছে যার পরিণতিতে গিয়ে সেই বামপন্থারই কবর খোঁড়া হবে, ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান হবে। কারণ, দেশের জমিতে যখন যুক্তিবাদী মন মরে যায় তখনই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা সমাজজীবনে প্রবেশের সহজ রাস্তা সৃষ্টি হয়। একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষে মানুষকে ফ্যানাটিক (অতিশয় উগ্র) করা, অন্যদিকে পুরনো ঐতিহ্যবাদ এবং ভাসাভাসা সমাজতন্ত্র, বিপ্লব, আর প্রগতির স্লোগান — এই তিনটিকে যদি একত্রে মেলানো যায় তাহলেই একটা দেশে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি হয়। মনে রাখা দরকার, শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করে একমাত্র তখনই এই তিনটিকে সুন্দরভাবে মেলাতে পারে যখন দেশে সত্যই যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মনোভাব সমাজজীবন থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থাতেই ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ। তাই আমি বামপন্থীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলাম যে, কংগ্রেস এবং শাসকশ্রেণীর দল দেশের মধ্যে এরকম যুক্তিহীন মানসিকতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেই। তারা তো চাইবেই এ ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠুক। কিন্তু বামপন্থীরা নিজেদের দলীয় স্বার্থের জন্যও কেন এমন ধরনের আচরণ করবে? যদি করে তাহলে সাময়িকভাবে তা তার পক্ষে লাভজনক হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে সেটাই হবে তার কবর খোঁড়ার প্রশস্ত রাস্তা। তাই যুক্তিহীন মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের চর্চা, আলাপ-আলোচনা, পরস্পরের মতের উপর আলোচনা ও সমালোচনা এবং তর্কাতর্কির পরিবেশ থাকা দরকার। একমাত্র এ ধরনের পরিবেশ গড়ে উঠলেই শোষকশ্রেণীর কোনও দলের পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে

যাই হোক, যে প্রশ্ন আমি তুলেছিলাম যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্ক, আর উৎপাদনের পুঁজিবাদী উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থেকে উৎপাদনকে মুক্ত করতে না পারলে আমাদের দেশে ক্রমাগত শিল্পোন্নয়নের রাস্তা খুলে দেওয়া সম্ভব কিনা। দ্বিতীয়ত কৃষিতে আধুনিকীকরণ করার মধ্য দিয়ে যে বেকারের সৃষ্টি হবে, শিল্পোন্নয়নের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের দ্বার খুলে দিতে না পারলে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা? আর যখন শাসকশ্রেণীর পক্ষে এ জিনিস করা সম্ভব হচ্ছে না তখনই দেখা যাচ্ছে, তারা মাঝে মাঝে 'জাতির সঙ্কট' — এই হাওয়া তুলে জনসাধারণের অর্থের অপচয় করে পুলিশ খাতে এবং সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে যুব সম্প্রদায়কে কিছু কিছু কাজ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু, পুলিশ, সরকারি কর্মচারী, আর মিলিটারিতে কত লোককে চাকরি দেবে? তাছাড়া, এতে দেশের অর্থনীতির কী বিরাট অপচয় হচ্ছে! কারণ, প্রতিদিন তো আর যুদ্ধ লেগে থাকে না। অথচ, সমাজের উপর এ ধরনের একটি প্যারাসাইট ইন্‌স্ট্রুমেন্ট (পরজীবী সংগঠন) কোটি কোটি টাকা খরচ করে রক্ষা করতে হয়। কী বিরাট জাতীয় অপচয়! আমাদের মতো একটি অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশেও এরূপ অপচয় এই কারণেই করতে হয় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেকার সমস্যার আজ আর কোনওরূপ সমাধান সম্ভব নয়। অথচ, শিল্প বিপ্লবের যুগে, রেনেসাঁসের যুগে, যখন সামন্ততন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদ এসেছে, পুঁজিবাদ যখন বিপ্লবী পুঁজিবাদ ছিল, তখন এই পুঁজিবাদই মানুষের জন্য প্রতিদিন নিত্যনতুন কর্মসংস্থানের উপায় বের করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ অবাধ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কলকারখানা তখন নিত্যনতুন গড়ে উঠেছে। কলকারখানায় কাজ করার লোকের চাহিদা বাড়ছে। ফলে সে তখন কৃষিতে বৈজ্ঞানিকীকরণ করেছে, বিগ ফার্মিং (বড় বড় জমিতে চাষ) -এর প্রবর্তন করেছে, এক ধাক্কায় গ্রামের লোকগুলোকে শহরে এনেছে এবং কাজ দিয়েছে। লোকে তখন কাজ পেয়েছে। আমি তো এতদিন জানতাম, একটা দেশে শিল্পোন্নয়ন হলে আরও মানুষ চাই, ম্যান পাওয়ার (মানুষের শ্রমশক্তি) চাই — এই স্লোগান ওঠে। ফলে, কৃষিতে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

অথচ, আমাদের দেশে ঠিক উল্টো জিনিস ঘটছে। এখানে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে শিল্পোন্নয়নের। আর সাথে সাথে চেষ্টা হচ্ছে, কী করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে খণ্ড খণ্ড জমিতে বেশিরভাগ মানুষকে চাষবাসের মধ্যে আটকে রাখা যায়। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে দেশের পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটবে কী করে? তাহলে দেখা যাচ্ছে, কৃষির আধুনিকীকরণ, শিল্পের ক্রমোন্নয়নের দ্বার খুলে দেওয়া, অর্থনীতির পরনির্ভরশীলতা দূর করা এবং বেকার সমস্যার সমাধান করা প্রভৃতি মূল সমস্যাগুলির সমাধান জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা এবং গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে মুক্ত করার প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এইসব বিচার-বিশ্লেষণ করেই আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমাদের দেশের মূল সমস্যাগুলির সমাধান একমাত্র পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথেই করা সম্ভব। আর অন্য সব পথই হচ্ছে ভ্রান্ত পথ এবং তা ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে টিকিয়ে রাখতেই সাহায্য করছে।

ফ্যাসিবাদী মানসিকতা

আমাদের দেশের যে সমস্ত ছাত্র-যুবকরা বামপন্থীদের ত্রুটি-বিচ্যুতিজনিত প্রতিক্রিয়া থেকে শাসক কংগ্রেসের পেছনে আজ জড়ো হয়েছেন তাঁরা কি শুধু 'ইন্দিরা জয়' গেয়ে এবং বামপন্থীদের গালাগালি করে আমাদের দেশের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবেন? ফলে, তাঁদের আজ এই জিনিসটা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। তাঁরা বলছেন, কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করেছে, সি পি আই (এম) খুন দাঙ্গা করেছে, আমরা সর্বনাশ করেছি। ধরে নিন, আমরা যা করেছিলাম তা মারাত্মক ভুল। আমরা সর্বনাশ করেছি। রাস্তা আমরা পাইনি। তাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তার জন্য ইন্দিরা সমাজতন্ত্র আনবে — একথা প্রমাণ হয় নাকি? এবং তার জন্য তাকে সমর্থন করার কোনও যুক্তি আছে কি? সেখানে আমরা বামপন্থীরা যদি ভুল করে থাকি, তাহলে সেই ভুলটা সংশোধন করার কথা ওঠে। অথচ, তা না করে একটা জানাশোনা রাস্তায় যে নব কংগ্রেস ফ্যাসিবাদকে সংহত করার মধ্য দিয়ে দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে, তাঁরা সেই রাস্তাকেই সমর্থন করে চলেছেন। তাই দেখুন, তাঁদের মধ্যে কী অদ্ভুত ধরনের যুক্তিবাদ গড়ে উঠছে। তাঁরা বলছেন, সি পি আই (এম) গুণ্ডামি করেছে, তাই তাঁরাও গুণ্ডামি করেছেন। সি পি আই (এম) গায়ের জোরে বুথ দখল করেছে, তাই তাঁরাও জোর করে বুথ দখল করেছেন এবং আর এক পা এগিয়ে গিয়ে বাক্স ভেঙেছেন। আমি শুনেছি, প্রেস-এর লোকেরাও নাকি এইভাবে যুক্তি করে যে, 'ও মশাই সুবিধে পেলে এসব সকলেই করে। ওতো সি পি আই (এম)-ও করেছে'। আমি বলি, একী অদ্ভুত যুক্তিধারা! এসব তো সেই ডাকাতের যুক্তি হল যে, অমুকে চুরি করেছে, তাই আমি ডাকাতি করেছি। তা গোটা দেশটা কি চোর-ডাকাত হয়ে গেল নাকি? একজন চুরি করেছে বলে আর একজনের ডাকাতি করার অধিকার জন্মায় নাকি? তাহলে চোরকে নিন্দা করার তাদের কী অধিকার আছে? তাহলে তো ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কে কত বড় চোর হব এবং ডাকাত হব তার জন্য আমরা সকলেই লড়ালড়ি করছি। নাহলে একজন যদি চুরি করে থাকে, ডাকাতি করে থাকে, তাহলে তার আচরণ বন্ধ করার কথাই ওঠে। তাঁরা তো সি পি আই (এম) এবং অন্যান্য বামপন্থীদের এইজন্যই সমালোচনা করেছিলেন যে, তারা দাঙ্গাবাজি করেছে, মারদাঙ্গা করেছে, ক্রাইম করেছে। তার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যই তো তাঁরা ক্ষমতা চেয়েছিলেন এবং জনসাধারণের কাছে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ভোট চেয়েছিলেন। তাঁরা তো এইজন্যই তাঁদের বিরুদ্ধতা করেছিলেন যে, তাঁরা এইসব করতে চান না এবং অপরকেও তাঁরা এইসব করতে দেবেন না। তাহলে তাঁরা কোন যুক্তিতে আজ সেই কাজগুলো করছেন? অথচ, এই ধরনের যুক্তিহীন মানসিকতা আজ প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে। আর, এই পথ বেয়েই লোকচক্ষুর আড়ালে দেশে একটা সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ গড়ে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে।

নৈতিকতার সংকট

তাই নৈতিকতার সংকটের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। একথা ঠিক যে, দেশে খাদ্য সংকট তীব্র হচ্ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না, বেকার সমস্যা বাড়ছে, বিদ্যুৎ নেই — এই সমস্ত সমস্যায় আমরা ঘরে ঘরে ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় ক্ষতি, নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এবং যুক্তিহীন মানসিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমাজজীবনে যে

সমস্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে, সেখানে ঘটছে। মনে রাখা দরকার, অভাব এবং অত্যাচারের তাড়না যতই হোক না কেন তার দ্বারা একটা জাতিকে মেরে ফেলা যায় না। ব্রিটিশরা দুশো বছরের উপর আমাদের পদানত করে রেখেছিল। কিন্তু, গোটা জাতিটাকে মারতে পারেনি। ভিয়েতনামকে বোমা মেরে মেরে আমেরিকা মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে এবং সেখানকার মানুষগুলোকে একেবারে মাটির তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গোটা দেশের, জাতির মেরুদণ্ড ভাঙতে পারেনি। কিন্তু, আমাদের দেশের শাসক সম্প্রদায় আজ দেশে কি শুধু অর্থনৈতিক দুর্দশাই সৃষ্টি করছে? যে যুক্তি দ্বারা তারা নিজেদের অন্যায় আচরণকে সমর্থন করছে, লোককে সমর্থন করতে বলছেন, পুলিশ যেভাবে প্রকাশ্যেই প্রতিদিন আইনকে পদদলিত করে চলেছে, এবং পুলিশের এইসব আচরণকে রাজনৈতিক নেতারা এবং প্রশাসকরা যেভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন; উপরন্তু, যুক্তিহীন মানসিকতা যদি এমন স্তরে পৌঁছে থাকে যে, দেশের তরুণরাও কোনও কিছু বুঝতে না চান, রাস্তাঘাটে অশালীন আচরণ করেন এবং তা দেখে বয়স্করাও চুপ করে থাকেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অপরের মতামত সম্বন্ধে সহনশীলতার এরূপ অভাব ঘটে থাকে, তাহলে কী প্রমাণ হয়? শুধু আমরা খেতে পাচ্ছি না এবং আমাদের অভাব — এইটেই প্রমাণ হয়? নাকি, এটাও প্রমাণ হয় যে, আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে? মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেতে পেলেও সে লড়ে যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ, মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাধা সৃষ্টি করে।

যখন পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও আমি এ বিষয়ে বারবার বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তখন আমাদের কথা কেউ শুনতে চায়নি। বরং আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে, আমরা নাকি ডিস্‌রাপ্‌টার (বিভেদকামী), আমরা ঐক্য নষ্ট করছি। ঐক্যের স্বার্থে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে যখনই কোনও দলের কোনও ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা বলতে গিয়েছি তখনই ঐক্যবিরোধী বলে ব্যুয়িং করে, শোরগোল করে আমাদের বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অথচ, সেই ঐক্য গড়ে উঠে কী হল? ঐক্য তো গড়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে সমবেত হয়েছিল। তাদের সমর্থনও যুক্তফ্রন্টের পিছনে ছিল। তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল কী করে? আমার মনে পড়ে, আমি তখনও এই বিপুল জনসমর্থনের নৈতিকতার মানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলাম যে, এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থন দেখে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তারা দুনিয়ার ইতিহাসের গতি লক্ষ করেনি। তাদের বোঝা দরকার যে, এই সমর্থনটাই আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই বিপুল জনসমর্থনের রাজনৈতিক চেতনার মান, সাংস্কৃতিক মান ও নৈতিক মান কতটুকু? যে মানুষগুলোর সমর্থন আমরা পাচ্ছি সেই মানুষগুলোর নিম্নগামী সংস্কৃতিগত মানের দিকে আমরা এতটুকু লক্ষ রেখেছি? বরং তারা আমাদের সমর্থন করছে বলে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে আমাদের অসুবিধে হবে বলে তাদের যেকোনও কাজকেই আমরা সমর্থন করেছি।

তাই সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন প্রসঙ্গেও সেদিন আমি একটা কথা বলেছিলাম। আমি তাঁদের বলেছিলাম যে, এই যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের ভোটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা তাঁদের সরকার, তাঁদের গভর্নমেন্ট। তাঁরা চেয়েছেন তাই হয়েছে। এই সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন দেশে হাজার একটা সমস্যা বর্তমান। গ্রামাঞ্চলে ছোট চাষীদের সাহায্য দরকার এবং গ্রামে সেচব্যবস্থার দরকার। বেকারদের কিছু কিছু ভাতা দিতে পারলে তাও দেওয়া দরকার। আমরা সরকারের গদিতে বসে মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারব না। কিন্তু, এ কাজগুলো আমরা করতে পারি। অথচ, টাকা নেই বলে এটুকুও আমরা করতে পারছি না। সেই ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা, যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা মাস গেলে যা হোক কিছু মাইনে পাচ্ছেন। যদিও তা দেশের জিনিসপত্রের মূল্য অনুযায়ী প্রচুর নয়, তা আমি জানি। তাঁদের অভাব আছে এবং তাঁদের আরও পাওয়া দরকার — এ কথাও সত্যি। কিন্তু, একথাও তো সত্য যে, দেশে যারা বেকার, অর্ধবেকার এবং গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত সেচব্যবস্থা না থাকায় সারা বছর চাষের কাজ থাকে না বলে চাষীদের যে শোচনীয় অবস্থা হয়ে পড়েছে, তাদের সমস্যা তাঁদের এই অল্প এবং কম মাইনে পাওয়ার চেয়েও গুরুতর সমস্যা। তাহলে, এই সরকারটা যদি তাঁদের সরকার হয়, আর তাঁরা যদি রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হন, জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের অধিকারী হন, তাহলে তাঁরা নিজেরাই তো এই সরকারকে বলবেন যে, তাঁদের চেয়ে যারা কম পায়, তাঁদের চেয়ে যারা অভাবী, সরকারের যতটুকু টাকা আছে প্রথমে

তাদের দেওয়ার চেষ্টা হোক, তারপর থাকলে তাঁরা নেবেন। আর যদি টাকা না থাকে, তাহলে এই বিপুল জনসমর্থনকে সংহত করে আন্দোলন গড়ে তুলে চাপ দিয়ে ও লড়াই করে কেন্দ্র থেকে টাকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হোক — এই তো তাঁরা বলবেন আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু, তা হল না। বামপন্থী আন্দোলনের সমর্থক সরকারি কর্মচারী হয়েও তাঁরা ঠিক উল্টোটাই ভাবলেন। তাঁরা ভাবলেন যে, যখন তাঁদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন তাঁদের দাবিই আগে মিটিয়ে দেওয়া দরকার। আমি তখনই বলেছিলাম, এটা কী ধরনের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন আন্দোলন হল? সেদিন এরূপ কাণ্ড ঘটা সম্ভব হয়েছিল সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের জন্য। সরকারি কর্মচারীদের দাবি মেটাতে কত কোটি টাকা চলে গেল, অথচ জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি আমরা বামপন্থী দলগুলো দিয়েছিলাম তার কতটুকু আমরা পূরণ করতে পারলাম? সেদিন ২৪শে এপ্রিলের এরকম একটি জনসভায় যেই আমি এই কথাটা বললাম, অমনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু হয়ে গেল যে, আমরা নাকি সরকারি কর্মচারীদের দাবি সমর্থন করি না। আমরা নাকি মনে করি যে, তাঁদের দাবিটা অন্যায়। এই কথা বলে সাধারণ সরকারি কর্মচারীদের আমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া হল। অথচ, আমি বলতে চেয়েছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা। আমি বলতে চেয়েছিলাম, তাঁরা বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী। তাঁরা যখন একটা ন্যায্য দাবি তুলবেন তাকে সকলেই সমর্থন করবে। কিন্তু এই দাবি তোলার সাথে সাথে তাঁদেরও সমাজের প্রতি, জনসাধারণের প্রতি দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সমাজের প্রতি দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন না, কর্তব্য ঠিকমতো পালন করবেন না — এইটাই কি যথার্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনা? এই কথাটাই আমি ভেবে দেখতে বলেছিলাম। অথচ, এগুলো যখনই বলতে গেছি তখনই সিপিআই(এম) নেতারা বলেছেন, আমরা নাকি তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি দেখে আতঙ্কিত হয়ে এই সব কথা বলছি।

আর একটা সমস্যার কথাও আমি তখন তুলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, যে কোনও বড় আদর্শের মর্মবস্তু তার সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে নিহিত থাকে। সংস্কৃতিগত এবং রুচিগত মান যদি উঁচু না থাকে, তাহলে যেকোনও একটি উঁচুদরের রাজনৈতিক আদর্শের ধাঁচাটা একটা প্রাণহীন দেহের মতো হয়ে যায়। একটা শরীর দেখতে খুব সুন্দর হলেও যদি তার প্রাণ না থাকে তাহলে তা যেমন অকার্যকরী, ফেলে রেখে দিলে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, তেমনি কেউ কোনও একটা বড় আদর্শের কথা বলেও যদি উন্নত রুচি এবং সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত না করে তাহলে সেটাও ঠিক সেইরকম সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং পচনশীল। কাজেই কোনও একটা পার্টি আদর্শের বড় বড় কথা বলছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। তাদের আদর্শ সত্যিই বড় কিনা তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, তাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ ব্যক্তিগত জীবনে, প্রতিদিনের ব্যবহারে ও রাজনৈতিক আচার-আচরণে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে কিনা। ফলে, সিপিআই(এম) যদি সত্যিকারের বিপ্লবী দল হয় তাহলে তার প্রভাব বৃদ্ধির ফলে সমাজের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের অবক্ষয় থেকে যে নিম্নগামী মান এবং নৈতিকতার অধঃপতন শুরু হয়েছে তার উপর একটা রেস্ট্রেনিং এফেক্ট (কার্যকরী বাধা সৃষ্টি) হবে। কিন্তু তা দেখা গেল না। বরং, উল্টোটাই ঘটতে দেখা গেল। রেস্ট্রেনিং এফেক্ট তো হলই না, উপরন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে যখন সিপিআই(এম)-এর প্রভাব যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল, দেখা গেল সেই সময়েই প্রথম ছাত্রদের মধ্যে গণ-টোকাটুকি শুরু হয়েছে। তাদের দলে যে যুবসম্প্রদায় আসছে, তারা যখন স্লোগান দিচ্ছে তাদের কোমর দুলছে। যারাই তাদের কোনওরূপ সমালোচনা করতে গেছে, তাদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ কর্মীর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে রুচিগত ও সংস্কৃতিগত মান প্রকাশ পেয়েছে তা অত্যন্ত নিম্নস্তরের। তারা যুক্তিতর্কের মধ্যেই আসতে চায়নি, মানুষ বলেই কাউকে গ্রাহ্য করেনি। কেউ বিরোধিতা করলেই তাকে হয় মেরেছে, আর না হয় নানাভাবে হিউমিলিয়েট (অপমানিত) করেছে। তাহলে, এই আচরণের সঙ্গে ফ্যাসিস্টদের, উগ্র ফ্যানাটিক (অন্ধ সমর্থক)দের, যারা যুক্তিহীন অন্ধ মানসিকতা সমাজে গড়ে তুলতে চায় তাদের সঙ্গে এইসব তথাকথিত বিপ্লবীদের আচরণে পার্থক্য কোথায়? তাই আমি তখন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলাম, জনসাধারণকে খেপালেই বিপ্লব হয় না। বিপ্লব সেই জনসাধারণই করতে পারে, যারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষিত হয়ে খানিকটা অর্থে বিপ্লবের উপযোগী মানসিকতা এবং সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে। যে কোনও উপায়ে মানুষকে উত্তেজিত করলেই তার দ্বারা বিপ্লব হয় না, বিপ্লবের নামে প্রতিক্রিয়ার জমি তৈরি হয়। ভারতের মাটিতে বারবার ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছে। ফলে, এই মারাত্মক ভুল রাজনীতি ও কার্যকলাপের জন্য সমাজমানসে যে যুক্তিহীন মানসিকতা বিরাজ করছে তারই

সুযোগে আজ কংগ্রেসি প্রতিক্রিয়ার প্রবল অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অতীতের ভুল-ত্রুটি যাই হয়ে থাকুক না কেন তাকে সংশোধন করে আবার আপনাদের সংগঠিত হতে হবে। অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে প্রতিদিনের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবার আপনাদের ধীরে ধীরে সংহত হতে হবে। এ যেমন সত্য কথা, তেমনি এর সাথে সাথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। তা হচ্ছে, এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে যদি আপনারা সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চান, অর্থাৎ জনগণের মুক্তির অর্থে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে চান, তাহলে এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত জরুরি প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলে চলবে না।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন

আমি আপনাদের কাছে বলছি, মানুষ আবার ভাবছে। না খেতে পাওয়া মানুষগুলো আবার ধীরে ধীরে মাঠে-ময়দানে জড়ো হতে শুরু করছে। উপর থেকে যত ঢাকঢোল পেটানোই হোক ভিতরে ভিতরে মানুষ কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহমুক্ত হচ্ছে। ফলে, অতীতে যেমন সম্মিলিত সংগ্রাম হয়েছে, বহু রক্তপাত হয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতেই, দু'চার বছরের মধ্যেই আবার সম্মিলিত জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠবে। কিন্তু আমি যে জায়গাটা নির্দিষ্ট করে বারবার বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, দুর্বার আন্দোলন আগেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই হবে। কিন্তু, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি ভুল পার্টি, অমার্কসবাদী পার্টি, অবিপ্লবী পার্টির হাতেই থেকে যায়, অর্থাৎ এমন দলগুলোর হাতে থেকে যায়, যারা বিপ্লবের নাম ভাঙিয়ে চলে, বিপ্লব-বিপ্লব খেলা করে, অর্থাৎ অসময়ে উগ্র আচরণ করে বিপ্লবের শক্তিকে নিঃশেষিত করে দেয়; আর না হয় বিপ্লব-বিপ্লব স্লোগানের আড়ালে শেষপর্যন্ত সংসদীয় রাজনীতির গণ্ডির মধ্যেই গণআন্দোলনগুলিকে আটকে রাখতে চায়, তাহলে সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তাছাড়া, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে একদিকে ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অপরদিকে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলির মিলনের জন্য ঐক্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় সেই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে এমনভাবে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা, যাতে আন্দোলনের ঐক্যও বিনষ্ট না হয়, অথচ আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়, জনগণকে সঠিক বিপ্লবী দল চিনে নিতে সাহায্য করা হয় — তেমন কায়দায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে পরিচালনা করার ক্ষমতা একমাত্র বিপ্লবী দলেরই থাকতে পারে। অবিপ্লবী দলের এ ক্ষমতা নেই। যুক্ত আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে অবিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে দুটো ঝোঁক দেখা দেবেই। হয় ঐক্য রক্ষা করার অত্যুৎসাহে তারা সকলকে অ্যাপিজ (তোষামোদ) করবে, আর না হয় উগ্র আচরণ করবে। অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধে কেউ সমালোচনা করলেই তারা তাদের আঘাত করে ঐক্যকে ভাঙবে। গত যুক্তফ্রন্ট আমলেও ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছে। তাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আজ যখন আবার পা বাড়াতে চলেছেন তখন সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথেই অতি দ্রুত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব যাতে সত্যিকারের বিপ্লবী দল দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন দলের রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে দল বিচার করে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে সেই দলকেও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

সঠিক বিপ্লবী দল বিচার প্রসঙ্গে

এখন স্বভাবতঃই আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমাদের দল এস ইউ সি আই যে সত্যিকারের বিপ্লবী দল তার প্রমাণ কী? কেউ নিজেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বললেই কি যথার্থ মার্কসবাদী হয়ে যায়? তাহলে তো আমাদের দেশে নিজেদের মার্কসবাদী বলে এমন অনেক দল আছে। যেমন, প্রথমে সি পি আই, তারপর সি পি আই (এম), তারপর সি পি আই (এম-এল)। তাছাড়াও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচিত ছোটখাট আরও দল রয়েছে। তাহলে কোন দল সত্যিকারের বিপ্লবী দল, কীভাবে তা বিচার করা সম্ভব? প্রথম কথা হচ্ছে, কোনও দল সত্যিকারের বিপ্লবী দল কিনা তা বিচার করতে হলে অন্যান্য বহু বিষয়ের সাথে প্রথমেই দেখতে হবে, যে দেশে সে জনগণকে নেতৃত্ব দেবে সেই দেশের রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বিপ্লবের স্তর এবং রণনীতি যা সে স্থির করেছে, তা ঠিক কিনা। কারণ, রাস্তা যদি ভুল হয়, রণনীতিটাই যদি ভুল হয়, তাহলে বিপ্লব-বিপ্লব বলে মানুষগুলোকে খেপিয়ে যে জায়গায় সে নিয়ে

যাবে সেটা ভুল রাস্তা। আর, রাস্তা ভুল হলে এবং বিপ্লবের মূল শত্রু চিনতে ভুল হলে কী হয়? ধরুন, বিপ্লব করতে হবে, লড়তে হবে, প্রাণ দিতে হবে, গ্রামে মাঠে লড়াকু জনসাধারণ সব তৈরি হও, — এই সব বলে জনসাধারণকে লড়াই-এর জন্য তৈরি করা হল। তারপর তৈরি হয়ে সেই জনসাধারণ কোথায় এবং কার বিরুদ্ধে গিয়ে লড়বে? না, মনুমেন্টের পাশ দিয়ে গিয়ে ওখানে যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আছে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের ভূত আর সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূরা আমগাছের তলায়, বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে — চল, সেখানে গিয়ে তাদের খতম করতে হবে। বিপ্লবের তত্ত্ব এবং রাস্তা ভুল হলে ব্যাপারটা প্রায় এইরকমই দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, রাস্তা ভুল হলে এত যে লড়াই হবে, এত যে ঘর পুড়বে, এত যে ত্যাগ স্বীকার হবে, এত মানুষের যে কোরবানি হবে — সবটাই জাতীয় অপচয়। বিপ্লবের একটা কর্মী, সর্বক্ষণের একজন কর্মী গড়ে তুলতে যে পরিশ্রম হয় সেই বিপুল পরিশ্রমে গড়ে-ওঠা কর্মীরা, রাস্তা যদি ভুল হয়, রণনীতিই যদি ভুল হয়, তাহলে বিপ্লব-বিপ্লব করে সারা জীবন সর্বস্ব দিয়ে যে আয়োজন তারা গড়ে তোলে, তা সবটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে, একটা দল ভুল করার পর, আমরা একটা ভুল করেছিলাম — একথা বললেই সব শেষ হয়ে যায় না। কী ভুল সে করেছিল সেটা একটা গুরুতর আলোচনার বিষয়। কারণ, সাধারণ মানুষ একটা ভুল করলে তার ফল ভোগ করে তার আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু, একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, হাজার হাজার মানুষ নিয়ে যে লড়ছে সে যদি ভুল করে তার ফল ভোগ করে দেশের মানুষ, জনসাধারণ। ফলে, দল বিচার সমস্ত আন্দোলনের সামনেই একটা গুরুতর বিষয়। আর, দল ঠিক কিনা তা বিচার করতে হলে প্রথমত দেখতে হবে, বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে তার ধারণাটি সঠিক কিনা।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভুল তত্ত্ব

এখন সি পি আই, সি পি আই (এম), এবং সি পি আই (এম-এল)-এর কথা যদি বিচার করি, তাহলে দেখা যাবে, এই তিনটি দলই ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তরকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বলছে। যদিও একে অপরের থেকে আত্মরক্ষার জন্য, একের সাথে অপরের পার্থক্য দেখাবার জন্য, একই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে তিন পার্টি তিন রকমের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের ব্যাখ্যাগুলিকে ঠিকভাবে অনুধাবন করলেই এ জিনিস ধরা পড়বে। যেমন, বিপ্লবের রণনীতির মূল প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণ, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনা প্রধানত কোন শ্রেণীর হাতে? কোন শ্রেণীর দ্বারা কোন শ্রেণীকে হঠিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে — এটাই হচ্ছে বিপ্লবের একটা প্রধান প্রশ্ন। বিপ্লবের সামনে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ সেই কারণে একটা প্রধান বিচার্য বিষয়। দ্বিতীয়ত, বিচার করে দেখতে হবে সেই সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বিশেষ করে মূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধাঁচাটি কী যদিও মনে রাখতে হবে, বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থা সবসময় মূল নিয়ামক বিষয় নয়। এ বিষয়ে যাঁরা লেনিনবাদের সঙ্গে সুপরিচিত, যাঁরা রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাস জানেন তাঁদের বেশি কথা নিশ্চয়ই আমার বলবার দরকার হবে না। অথচ সি পি আই-ও বলে, সিপিআই(এম)-ও বলে যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ একেবারে স্যাচুরেশন পয়েন্ট-এ (চূড়ান্ত পর্যায়ে) গেলে তবেই নাকি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়। সি পি আই (এম) আবার এমনও বলছে, একটি পিছিয়ে পড়া স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা এবং সামন্তী ব্যবস্থার কিছু কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট থাকতে সেই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুর্জোয়া রাষ্ট্র আখ্যাই দেওয়া যায় না। তাহলে, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, নভেম্বর বিপ্লব কী অর্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব? কীভাবে নভেম্বর বিপ্লবে দুটো বিপ্লব ইন্টারওভেন হয়ে (পরস্পর মিশে) গেল এক সঙ্গে? আমি তো জানি যে, রাশিয়ায় নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পর কন্‌স্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ব্যান (নিষিদ্ধ) করে দিয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব ঘোষণা করার পরেও অ্যালায়েন্স উইথ দ্য হোল অব দ্য পেজেন্ট্রি (সর্বস্তরের কৃষকের সঙ্গে মৈত্রী) — এই স্লোগান বলশেভিক পার্টিকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ক্যারি করতে (চালিয়ে যেতে) হয়েছিল, যেটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান। এ জিনিস সেখানে ঘটেছে। লেনিনকে ট্রট্স্কির 'ওয়ার কমিউনিজম্'-এর স্লোগানের বিরুদ্ধে 'নিউ ইকনমিক্ পলিসি' গ্রহণ করতে হয়েছিল। এগুলো লেনিনকে কেন নিতে হয়েছিল? পুঁজিবাদ স্যাচুরেশন পয়েন্ট-এ পৌঁছলে এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ শেষ হয়ে গেলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর 'অ্যালায়েন্স উইথ দ্য হোল অব দ্য পেজেন্ট্রি' — এই স্লোগান তুলতে হয় না, এবং 'নিউ ইকনমিক পলিসি'ও গ্রহণ করতে হয় না। এটা সকলেই জানে। তাহলে, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের চিহ্নগুলি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত না হলে এবং পুঁজিবাদ

'স্যাচুরেশন পয়েন্ট'-এ না পৌঁছুলে কখনও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে না — একথা যারা বলে তারা নভেম্বর বিপ্লব, লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস'-এর তাৎপর্য কী তা বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, এবং বিপ্লবের সামনে আসল সমস্যা এবং বিপ্লবের বাস্তব প্রক্রিয়া কী — সেটাকেই গোলমাল করে ফেলেছে। যদিও আমি এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনার মধ্যে আজ যেতে চাই না। কিন্তু, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যখন তাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলছেন, তখন আমি সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারি না। কারণ, ভারতবর্ষের অবস্থা যদি রাশিয়ার মতো গোলমেলে হত, অথবা এর সাথে প্রাক্-বিপ্লব চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা বা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর যদি মোটামুটি খানিকটাও মিল থাকত, তাহলেও না হয় কিছু কিছু মাড্ল-হেডেড থিওরেটিসিয়ান (ঘোলাটে-বুদ্ধি তাত্ত্বিক)-এর পক্ষে এরকম বিভ্রান্তি সম্ভব বলে মনে করতাম। কিন্তু, যাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভ্রান্তি ঘটছে তাদের মাড্ল-হেডেড বলাও মুস্কিল।

আমি এ প্রসঙ্গে এখানে যে প্রশ্নটা তুলতে চাইছি, তা হচ্ছে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে উৎপাদন-সম্পর্কের মূল চরিত্র কী? কিছুদিন আগে মজফরপুর কনফারেন্সে পেজেন্ট ফ্রন্ট (কৃষক ফ্রন্ট)-এ কর্মীদের টাস্ক (করণীয় কাজ) কী সে সংক্রান্ত দলিলে সি পি আই (এম) যে প্রস্তাব নিয়েছে যার উপর প্রমোদবাবু 'গণশক্তি'র একটি সাপ্লিমেন্টারি কপিতে লিখেছেন, 'ধনতন্ত্র কৃষকসমাজের মধ্যে চূড়ান্তভাবেই অনুপ্রবেশ করেছে'। অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং পুরনো জমিদার সম্প্রদায়রা দ্রুত গ্রামীণ পুঁজিপতিশ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাঁদের এই সর্বশেষ বক্তব্য অনুযায়ীই কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের 'চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ' ঘটে থাকলে গ্রামে শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র আর মূল বিরোধী শক্তি থাকছে না, যাকে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করতে হবে। আর, প্রমোদবাবু বা রণদিভেরা নিশ্চয়ই বলবেন না যে, ভারতবর্ষের কলকারখানাগুলোতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হয়। তাহলে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বিকাশের সামনে সামন্ততন্ত্র কীভাবে প্রধান বাধা হিসাবে থাকছে? এবারে দেখা যাক, রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে তাঁরা কী বলেন। এখানেও দেখা যাবে, নকশালপন্থীদের থিওরেটিক্যালি ফাইট্ (তত্ত্বগত দিক থেকে বিরোধিতা) করার পর থেকে, আগের থেকে নয়, 'পিপল্স্ ডেমোক্র্যাসি'-তে — বুর্জোয়া কাগজ থেকে উদ্ধৃতি দেব না, তাদের কর্মীদের 'পিপল্স্ ডেমোক্র্যাসি' পড়ে দেখতে বলব — বি টি রণদিভের লেখা এবং অন্যান্যদের লেখার মধ্য দিয়ে একটা জিনিস আসছে বারে বারে। তাতে তাঁরা বলছেন, ভারতবর্ষে ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে বুর্জোয়ারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বুর্জোয়াকে প্রতিনিধিত্ব করত এবং ন্যাশনাল রিফর্মিজমকে প্রতিনিধিত্ব করত, অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, তারাই আপসের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করেছে এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে। এবং সুবিধামত 'বৃহৎ বুর্জোয়া' প্রভৃতি শব্দগুলো তাঁরা যেখানেই এবং যেভাবেই ব্যবহার করুন না কেন, ভারতবর্ষে আজ যে একচেটে পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছে একথাও তাঁরা অস্বীকার করতে পারছেন না। ফলে, দেখা যাচ্ছে, সি পি আই (এম)-এর মতে ভারতবর্ষ একটা 'আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র' নয়, যেমন নকশালপন্থীরা বলছেন। সিপিএম নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ীই — ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে স্বীকার করাতে পশ্চাৎপদ হোক, যাই হোক এটা একটা জাতীয় রাষ্ট্র, যার ক্ষমতায় রয়েছে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াই করেছে। আবার আজকে এরই সঙ্গে যোগ করে তাঁরা বলছেন, গ্রামীণ অর্থনীতিতেও পুঁজির 'চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ' ঘটেছে। অথচ, বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরাই আবার বলছেন, 'হাউএভার দ্য অবজেক্ট অব আওয়ার রেভোলিউশন রিমেন্স অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট, অ্যান্টি-ফিউডাল" অর্থাৎ 'যাই হোক্, আমাদের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবের স্তরেই রয়ে গেছে'। এরকম উল্টোপাল্টা স্ববিরোধী দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তাঁরা না পারছেন সরাসরি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে, না পারছেন আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করতে। ফলে, এরূপ অবস্থার সামনে পড়ে তাঁরা রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের যে অপূর্ব ব্যাখ্যাটি দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তা হচ্ছে, 'বুর্জোয়া ল্যান্ডলর্ড স্টেট হেডেড বাই বিগ বুর্জোয়া' — বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র। আর, এ সমস্তই করতে হচ্ছে, ভারতবর্ষের বিপ্লবের বাস্তব অবস্থার ঘাড়ে জোর করে তাঁদের মনগড়া এবং বিদেশ থেকে নকল করা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বটি চাপাবার ফলে। যদিও এই প্রসঙ্গে আমি তাঁদের কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রাষ্ট্রের এই অপূর্ব ব্যাখ্যাটিও সি পি আই (এম) নেতৃত্বের কৃতিত্ব নয়। সি পি আই-এর শোধনবাদী নেতৃত্ব পালঘাট কংগ্রেস থেকে অমৃতসর কংগ্রেস পর্যন্ত রাষ্ট্রের চরিত্র অনুরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা

করেছেন। আর, এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে তাঁরা আরও একটি যুক্তি দিয়ে থাকেন। তা হচ্ছে, ধাপে ধাপে বিপ্লব করতে হবে, এক লাফে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় না। কে বা কারা এক লাফে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে চাইছে তাঁরাই জানেন। তবে এ ধরনের যুক্তি দেখে মনে হয়, যেহেতু তাঁদের নেতৃত্বে আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মতো একটা বিপ্লব হয়নি, সেহেতু আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করল কী করে?

ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে

যাই হোক, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে বিপ্লব, সেই বিপ্লব মার্কসবাদী পরিভাষায় কী বিপ্লব? রাশিয়ায় জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং কেরেন্স্কি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওদেশেও এরকম কিছু মার্কসবাদী বলেছিলেন যে, এখনও তো বুর্জোয়া বিপ্লবই সম্পূর্ণ হয়নি। অর্থনীতিক্ষেত্রে যেখানে এখনও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও সামন্ততন্ত্র রয়েছে, পুঁজিবাদ স্যাচুরেশন পয়েন্ট-এ যায়নি এবং এখনও যেখানে বহু ডেমোক্রেটিক রিফর্ম বাকি রয়েছে — সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে কী করে? লেনিন তাদের আচ্ছা করে কান মলে দিয়ে তাঁর 'এপ্রিল থিসিসে' বললেন, এ দুটো বিপ্লব ওয়াটার-টাইট কম্পার্টমেন্ট নয়। তিনি বললেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসর অথবা পশ্চাৎপদ যাই অবস্থা থাকুক, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি যাই অপূরিত থাকুক, যে মুহূর্তে কেরেন্স্কি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছে সেই মুহূর্তে রাজনীতিগতভাবে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে আমাদের বিপ্লব 'টু দ্যাট এক্সটেন্ট সোস্যালিস্ট রেভোলিউশন' (সেই অর্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব)। 'এপ্রিল থিসিসে' তিনি এই কথা বলেছেন। এটা মার্কসবাদ কিনা এবং মার্কসবাদী ব্যাখ্যা কিনা, আমার মার্কসবাদী বন্ধুরা উত্তর করলে আমরা খুশি হব।

ভারতবর্ষে আজ যেখানে পুঁজিবাদী শোষণের জন্য ক্রমাগত বাজার সংকোচন হচ্ছে, বাজার সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে শিল্পোন্নয়ন করা যাচ্ছে না, যার ফলে এমনকী যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে সেই অনুযায়ীও সবসময় পুরো উৎপাদন করা যাচ্ছে না, যার ফলে দিনের পর দিন বেকার সংকট বেড়ে যাচ্ছে এবং যেখানে মজফফরপুরে গৃহীত সি পি আই (এম)-এর প্রস্তাব অনুযায়ীই কৃষিতেও পুঁজির চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেখানে সামন্ততন্ত্রটা কোথায়? কোন জায়গায় সামন্ততন্ত্র? ফলে, শিল্প অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো কথাই ওঠে না, গ্রামীণ অর্থনীতিতেও সামন্ততন্ত্র আজ আর মূল প্রতিবন্ধক নয়। আর, রাষ্ট্রশক্তির ক্ষেত্রে অন্য সব কথা না বুঝলেও সাম্রাজ্যবাদ যে এখানে সরাসরি প্রতিবন্ধক নয়, আজ সরাসরি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুর্জোয়াশ্রেণী, একথা বুঝতে তো একজন সাধারণ মানুষেরও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ফলে, যেখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে — তা সে হেডেড বাই বিগ বুর্জোয়াই হোক, আর যাই হোক — তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য ও সম্পর্ক থেকে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে হবে ; সেখানে বিপ্লবটা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয় কী করে? তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব গ্রহণ করার ফলে যে আসল শত্রু তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সবসময়ই কাল্পনিক শত্রু খাড়া করা হয়। এরূপ অবস্থায় বিপ্লবের উদ্দেশ্যে লড়াই শুরু করলেও তা শেষপর্যন্ত বিপ্লব-বিপ্লব খেলায় পর্যবসিত হয় এবং এইভাবে জনগণের বিপ্লবী স্পৃহাকে ভুল রাস্তায় চালনা করে অসময়ে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। তাই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা পুঁজিবাদকে শেষপর্যন্ত আঘাত করা যাবে না, যে পুঁজিবাদ আজ প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে মূল বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভুল তত্ত্বজনিত পরিণতি

সি পি আই (এম) সরকারে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিড়লা এবং অন্যান্য পুঁজিপতিদের একটু সন্দেহ ছিল যে, সি পি আই (এম) যখন এত গরম গরম স্লোগান দেয় এবং কমিউনিজমের কথা বলে, না জানি সরকারি গদিতে বসলে কী না কী হবে। কিন্তু, যেই কেরালায় তারা ক্ষমতায় এল, তার অভিজ্ঞতা থেকে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হতে শুরু করল। তখনকার অদ্ভুত কতকগুলি জিনিস আমার মনে পড়ে। সি পি আই (এম) যখন পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় এল তখন প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট (ব্যবসায়ী গোষ্ঠী)

এখানে যারা আছে তারাও ভীত হয়ে পড়েছিল এবং ভাবছিল যে, তারা ব্যবসাপত্র গোটাবে কিনা। কিন্তু, ব্রিটিশ পত্রিকা 'গার্ডিয়ান' তাদের উপদেশ দিয়ে বলল যে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ, এরা সে কমিউনিস্ট নয়, এরা খুব ভাল লোক। বুদ্ধিমানের মতো ডিল (আচরণ) করতে পারলে, ম্যান্‌লি ডিল (সাহসের সাথে আচরণ) করতে পারলে ঠিক কাজ হবে। বিড়লারাও তাই ভাবল। তাদের ভাবখানা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এইরকম যে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাস্তায় যত ইচ্ছে লোক খেপাও। বরঞ্চ, দরকার হয়, এতে কিছু টাকাও না হয় দেব। প্রকাশ্যে যদি না পারি গোপনে দেব। তাতে কিছু ক্ষতি নেই। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী এই বিপ্লব যে একটি কাল্পনিক বিপ্লব, এই কথাটা দেরিতে হলেও বিগ বুর্জোয়ারা বুঝতে শুরু করেছে। ফলে, তারা দেখল এই যে বিপ্লবের নামে লড়াই চলছে, এতে তাদের কোনও অসুবিধে নেই। সত্যিকারের একচেটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের যে আঘাত — এ তা নয়। এই বিপ্লবের স্লোগান আসলে একটা শুকনো স্লোগান। এটা প্রকৃতপক্ষে বিড়লাদের গায়ে, টাটাদের গায়ে, একচেটে পুঁজিপতিদের গায়ে আঁচড় কাটে না। এ বিপ্লব হচ্ছে একটা খেলা। কারণ, এ বিপ্লবের রণনীতিটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত্রতন্ত্র বিরোধী। কাজেই এতে দেশের পুঁজিপতিদের বাস্তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

সিপিআই(এম) নেতারা এখন সর্বত্র বলছেন যে, তাঁরা নাকি বরবারই প্রচণ্ড ইন্দিরা বিরোধী এবং বক্তৃতাতেও তাঁরা সবসময়ই কংগ্রেসের বিরোধিতা করে থাকেন। আর, আমরা তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবের মধ্যে দেখতে পাই তাঁরাও ঐ সি পি আই-র মতোই ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে একটি প্রগতিশীল অংশ দেখতে পান। অন্তত এই সেদিন পর্যন্ত পেয়েছেন। কিছুদিন আগেও, ১৯৭০ সালেও, তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে তাঁরা বলেছেন, ইন্দিরা কংগ্রেস এমন কতকগুলো স্লোগান তুলেছে এবং এমন কতকগুলো মেজার (ব্যবস্থা) নিয়েছে যেগুলো নাকি জনগণের অ্যান্টি-মনোপলি ডেমোক্রেটিক অ্যাসপিরেশন-কে (একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা) প্রতিফলিত করছে। এই যখন তাঁদের বক্তব্য, তখনও তাঁরা বাইরে মাঠে-ময়দানে প্রতিদিন শাসক পার্টির বিরুদ্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আর, তাঁদের এই উক্তিগুলোর দ্বারা ইন্দিরা কংগ্রেসের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে কার্যত সাহায্য করা হচ্ছে — এসব কথা তখন আমরা বলতে গেলেই তাঁরা সবসময় শোরগোল তুলে কর্মীদের এই বলে বিভ্রান্ত করেছেন যে, আমরা নাকি শুধু তাঁদের স্ল্যান্ডার (কুৎসা) করি। আজও তাঁরা ইন্দিরার বক্তব্য তুলে কমরেডদের বোঝান যে, ইন্দিরা পর্যন্ত যেখানে বলছেন যে, সি পি আই (এম) তাঁর এমন শত্রু যে সে তাঁর বিরুদ্ধে জনসংঘ-স্বতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়, সেখানে এস ইউ সি আই বলছে, সি পি আই (এম) নাকি ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলতা দেখেছে। এমন মিথ্যা কথা আর কখনও হয়? তাঁদের কথা অনুযায়ী আমরা নাকি সব মিথ্যুক। আমি সি পি আই (এম) নেতাদের জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা তো নিজেদের মার্কসবাদী বলেন। তা, একটা দলকে বিচার করার মার্কসবাদী পদ্ধতি কী? কীভাবে তাকে বিচার করতে হয়? কোনও দল যদি বিপ্লবের কথা বলে, শাসক পার্টির বিরুদ্ধে খুব গরম স্লোগান দেয়, মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গরম স্লোগান দেয়, সেই স্লোগানগুলোর আসল রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে হয় কী দিয়ে? বুঝতে হয় শাসক দল সম্বন্ধে, পুঁজিপতিদের সম্বন্ধে তার মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবের ভিত্তিতে। ইন্দিরার বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) নেতারা যে অনেক গরম গরম কথা বলেন, সে তো সকলেই জানে। কিন্তু, এটা কী যুক্তি হল যে, যেহেতু ইন্দিরা বলেছেন, সি পি আই (এম) তাঁর মহাশত্রু, অতএব তাঁরা ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল দিক আছে — একথা বলেননি ? বরং তাঁরা ইন্দিরা কংগ্রেসের এমন কতকগুলো মেজারস (কাজ)-কে প্রগতিশীল বলেছেন, যেগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করারই মেজারস। যেমন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং আরও অন্যান্য কতকগুলো মেজার যেগুলো আসলে হচ্ছে, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়েলফেয়ার মেজারস (কল্যাণমূলক কাজ), যে ধরনের মেজারগুলো মুসোলিনি নিয়েছিল ইটালিতে, হিটলার নিয়েছিল জার্মানিতে। এই মেজারগুলো নেওয়ার পিছনে তাদের দু'টি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। একদিকে র‍্যাডিক্যাল স্লোগানে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা এবং কিছু সুযোগসুবিধা দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা রাখা, অন্যদিকে এই সুযোগে যতটা সম্ভব বিরোধীদের কোণঠাসা করা এবং দ্রুত অত্যাচার চালিয়ে কমিউনিস্টদের খতম করা। সি পি আই (এম) ইন্দিরা কংগ্রেসের যে মেজারগুলোকে, 'এক ধাপ অগ্রগতি', 'বৃহৎ ঘটনা', 'প্রগতিশীল পদক্ষেপ' এবং 'জনগণের একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ' বলেছে, আসলে সেই মেজারগুলো সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদকে আরও সংহত করে ফ্যাসিবাদের দিকে পদক্ষেপের সূচনা মাত্র। ইন্দিরা কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁদের উক্তিগুলো সম্পর্কে আমি যা বললাম, সেগুলো

তাঁদের পিপল্‌স্‌ ডেমোক্রেসিতে ছাপা হয়েছে। তাঁরা চাইলে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি।

শুধু এইটুকুই নয়। আজকে মার খেয়ে তাঁরা ইন্দিরা কংগ্রেসকে বলছেন, আধা-ফ্যাসিস্ট। অথচ, আমরা সেদিন বলেছিলাম যে, হতে পারে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, কিন্তু, ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা এবং ভয় এদের কাছ থেকে নেই। কারণ, বুর্জোয়াদের রক্ষণশীল অংশ কোনওদিন কোনও দেশেই ফ্যাসিবাদ আনেনি। সব দেশেই ফ্যাসিবাদ এনেছে বুর্জোয়ার সেই অংশ যারা র‍্যাডিক্যাল স্লোগান তুলে সাধারণ মানুষকে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে, নিজেদের পক্ষে তাঁদের টেনে আনতে পারে এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। তাই বুর্জোয়ারা এই তথাকথিত প্রগতিশীল অংশ যারা সমাজতন্ত্রের স্লোগান তুলতে পেরেছে, প্রগতির কথা বলতে পেরেছে, বিভিন্ন দেশে সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ তারাই এনেছে। রক্ষণশীল বুর্জোয়ারা যত ঘৃণিত লোক হোক, তারা ফ্যাসিবাদ আনতে পারেনি। তাই ভারতবর্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিজম-এর মধ্যেই ফ্যাসিবাদের বীজ নিহিত। একদিন ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিজম-এর গর্ভ থেকেই ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। আজ ভারতবর্ষেও সেই জিনিস ঘটতে চলেছে। আমি সি পি আই (এম) নেতাদের সেদিনের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাঁরা তখন বলেছিলেন — না, না, সিন্ডিকেট কংগ্রেসই চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। এরা ইন্দিরা কংগ্রেসের চেয়েও দেশের সামনে গ্রেটার মিনেস (আরও বড় বিপদ) হিসাবে দেখা দিয়েছে। তাই ভি ভি গিরির নির্বাচন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে পর পর তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে যেগুলো পিপলস্‌ ডেমোক্রেসিতে'তে প্রকাশিত হয়েছে, এতদূর পর্যন্ত তাঁরা বলতে শুরু করলেন যে, তাঁরা সিন্ডিকেট কংগ্রেসের মতো দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির গুরুত্ব কম করে দেখতে পারেন না। তাই এদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করার জন্যই তাঁরা ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বত্র একত্রে মুভ (কাজ) করতে বাধ্য। সেইজন্যই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে রোখবার জন্য তাঁরা সেদিন ইন্দিরা কংগ্রেসের একাংশের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার খোলাখুলি ওকালতি করেছিলেন। এর সঙ্গে যোগ করুন, তাঁরা আবার ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে অ্যান্টি-মনোপলি, অ্যান্টি-বিগ ল্যান্ডলর্ড (একচেটিয়া পুঁজিপতিবিরোধী এবং বৃহৎ জমিদার বিরোধী) সুস্থ ঝোঁকের আবিষ্কার করলেন এবং ইন্দিরার কতকগুলো কাজকে 'জনগণের একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ' বলে আখ্যা দিলেন। এরপর সিপিআই(এম) নেতাদের যদি আমি প্রশ্ন করি, ইন্দিরা কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁদের উপরোক্ত বক্তব্য এবং আচার-আচরণগুলোর সাথে সি পি আই-এর মৌলিক পার্থক্যটা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? কূট তর্ক করলে শেষপর্যন্ত গিয়ে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে সি পি আই (এম)-এর মতে ইন্দিরাজি হয়তো ইন্দিরা কংগ্রেসের সেই প্রগতিশীল অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন না, ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যেই অন্য আরেকটা অংশ এরকম প্রগতিশীল আছে। আর সি পি আই হয়তো মনে করে, ইন্দিরাজিই ইন্দিরা কংগ্রেসের সেই প্রগতিশীল অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু, সি পি আই (এম)-ও তো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভি ভি গিরির জয়কে কায়েমী স্বার্থ ও চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে 'পপুলার (প্রগতিশীল) ও গণতান্ত্রিক শক্তির জয়' বলে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিল তা বিশ্লেষণ করলে সি পি আই-র মতো তারাও যে ইন্দিরা কংগ্রেসকে প্রগতিশীল মনে করে, শেষ পর্যন্ত তাই গিয়ে দাঁড়ায়। তাহলে, আমরা যদি মনে করি, তাদের ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গোটা আওয়াজটাই একটা ইলেকশন রাজনীতি মাত্র, তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে?

আজ আমাদের দেশে বেকার সমস্যাকে কেন্দ্র করে তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে, যাকে মোকাবিলা করার জন্য বেকারি বিরোধী আন্দোলন আবার ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে, যে আন্দোলনের মধ্যে প্রায় সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলগুলিই রয়েছে। সি পি আই (এম) নেতাদের আমি এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁরাও তো স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের শাসক সম্প্রদায় দেশকে সর্বাত্মক পুঁজিবাদী বিকাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, দেশের ক্রমবর্ধমান এই বেকার সমস্যার প্রশ্নটি কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং উৎপাদনকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে মুক্ত করার প্রশ্নের সাথে জড়িত নয়? তাই যদি হবে, তাহলে তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির দ্বারা কী করে এই বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে, যেখানে এই বিপ্লব পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব নয়? তাহলে, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের প্রস্তুতি এড়িয়ে গিয়ে বেকারি বিরোধী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত বেকার যুবকরা কাজ পাচ্ছে না, শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে সি পি আই (এম) তাদের বড়জোর সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য জড়ো করতে

পারে মাত্র, যেমন কংগ্রেস চাকরি দেবে বলে যুবকদের জড়ো করেছিল, কিন্তু তার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তাহলে, এটাও তো একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র। কারণ, বেকার সমস্যার সমাধান যাঁরা করবেন তাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করলে কী করে করবেন? জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব তো পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব নয়। আর, আমাদের দেশে বেকার সমস্যার প্রশ্নটি মূলত পুঁজিবাদের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ফলে, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে না পারলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। তাহলে, তাঁরা যে একদিকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছেন, আবার অন্যদিকে বেকার সমস্যা সমাধানেরও কথা বলছেন — এ তো সেল্‌ফ কন্‌ট্রাডিক্‌টরি (স্ববিরোধী)। তাহলে, তাঁদের বেকারি বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে গিয়ে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, তাঁরা এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে বেকারদের শুধু ধরে রাখতে চান এবং তাদের উত্তেজিত করে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চান।

আমরা মনে করি, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশ স্যাচুরেশন পয়েন্ট-এ উঠেছে কি ওঠেনি, এটা একটা টিক্‌লিস্‌ অ্যান্ড মাড্‌ল-হেডেড ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বাংলিং (অপ্রয়োজনীয় এবং ঘোলাটে বুদ্ধি পণ্ডিতি কচকচানি) । আসল কথা হচ্ছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশের পথে, শিল্পোন্নয়নের পথে, কৃষির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করছে কিনা, এইটা বিচার করে দেখতে হবে। যদি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং উৎপাদন-সম্পর্কই মূলত এগুলোর ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করছে এবং যেখানে ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্বে রয়েছে, সেখানে পুঁজিবাদ স্যাচুরেশন পয়েন্ট-এ গিয়ে থাকুক বা না থাকুক, ভারতবর্ষের বিপ্লব পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করেছে। এমতাবস্থায়, যারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলে তাদের দু'ধরনের বিচ্যুতি ঘটতে বাধ্য। তার একটা হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে সংসদীয় রাজনীতি করতে করতে দল যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন তারা হঠকারী রাজনীতির পথে পা বাড়ায় এবং বিপ্লবের নামে যারা মূল শত্রু নয় তাদের বিরুদ্ধেই বিপ্লবটা কল্পনা করে মাঠে-ঘাটে এখানে সেখানে লড়াই লাগিয়ে দেয়, এবং এইভাবে ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে অসময়ে বিপ্লবের শক্তিকে নিঃশেষ করিয়ে দেয়। যেমন, যুক্তফ্রন্ট আমলের শেষের দিকে দেখা গিয়েছিল। সেই সময়ে তাঁরা সকলকেই জোতদারের দালাল বলে গালাগালি দিতে শুরু করলেন। অথচ, তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হিসাবে তাঁরা তাঁদের কলকাতা কংগ্রেসেই বলেছেন, ধনী চাষী হচ্ছে তাঁদের মিত্র শক্তি। সংবাদপত্রের লোক থেকে গ্রামের সমস্ত লোক এবং শহরের সমস্ত লোকই জানেন যে, আজকের দিনে গ্রামাঞ্চলে জোতদার বলা হয় ধনী চাষীকে। তাহলে, যে ধনী চাষী বা জোতদার তাঁদের কলকাতা কংগ্রেসের দলিল অনুযায়ীই তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র, সেই ধনী চাষী বা জোতদার বিরোধী বিপ্লবই নাকি তাঁরা শুরু করে দিয়েছিলেন। এমন কাণ্ডও ঘটতে আমরা দেখতে পাই! আসলে, এখানে-সেখানে দু'একটা জোতদারকে বাদ দিলে বাস্তবে সেই বিপ্লব তাঁরা জোতদারদের বিরুদ্ধে করেননি, করেছিলেন জোতদারের দালাল বলে চিহ্নিত করে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক অন্যান্য সমস্ত দলের বিরুদ্ধে। ফলে, তাঁদের তখনকার সেই বিপ্লবী সংগ্রামে পুঁজিবাদ অক্ষতই পড়ে রইল, বিড়লা হাউস অক্ষতই পড়ে রইল, ভারতবর্ষের রাষ্ট্র পড়ে রইল, তাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ল না। মূল শত্রু সমস্ত মাঠে-ঘাটে আবিষ্কার হয়ে গেল এবং বিপ্লবী অভ্যুত্থানের নামে বিপ্লবটা তাদেরই বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব অনুসরণ করলে মাঝে মাঝে বারবার এই ধরনের জিনিসই ঘটবে। আবার, এরই উল্টো প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দেবে বিচ্যুতির আর একটি দিক। সেটা হচ্ছে, বিপ্লবের বুলি আওড়াতে আওড়াতেই নানাধরনের মনগড়া সুবিধাবাদী যুক্তি করে করে, র‍্যাশানালাইজ করে করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণআন্দোলনগুলিকে শেষপর্যন্ত পার্লামেন্টারি রাজনীতির চোরাগলিতে আটকে ফেলার রাজনীতি, যেমন বর্তমানে হচ্ছে। তাঁদের উগ্র রাজনীতির জন্য যুক্তফ্রন্ট ও যুক্ত গণআন্দোলনগুলো ভেঙে যাওয়ার ফলে যে মার আজ তাঁদের আমাদের সকলকেই খেতে হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের বেশিই খেতে হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়ার ফল হিসাবে আবার ধীরে ধীরে সংসদীয় রাজনীতিতে স্কিপ করার (প্রবেশ করার) জন্যই, অন্য কোনও অর্থে নয়, তাঁরা বর্তমানে আবার বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর যুক্তফ্রন্ট এবং যুক্ত গণআন্দোলনের কথা বলতে শুরু করেছেন।

শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের ভুল তত্ত্ব

অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, বিগত যুক্তফ্রন্ট আমলে এই প্রমোদবাবুরাই একটা তত্ত্ব দাঁড় করালেন যে, এ

ধরনের যুক্তফ্রন্টের কার্যকারিতা নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, ঐ ধরনের বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। এখন 'শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট', মানে 'জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গড়ে ওঠার 'বাস্তব অবস্থা' দেখা দিয়েছে। তাঁরা তখন বলেছিলেন, তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মুখে অবিপ্লবী দলগুলির চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছে এবং জনগণ নাকি সবাইকে ফেলে দিয়ে তাঁদের পার্টির নেতৃত্বে সংহত হচ্ছে। আমি তখন একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম যে, যদি বাস্তব ঘটনা এই হয়ে থাকে যে, সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে জনগণ সংহত হয়েছে, সমস্ত মধ্যবর্তী দলগুলির শ্রেণীচরিত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তর অতিক্রান্ত, তাঁদের শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট, অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বাস্তব ঘটনা হিসাবে অবস্থান করছে, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সকলেই তাঁদের দলের নেতৃত্বে বিপ্লবের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে — তাহলে তো বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ। ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করার সময়ে এসেছে। তাহলে আবার নির্বাচনের স্লোগান উঠছে কেন? অথচ, এইসব বিশ্লেষণ করার পরবর্তী মুহূর্তেই দেখা যাচ্ছে, পার্টি নেতাদের কণ্ঠ থেকে 'সত্বর নির্বাচন চাই' — দাবি উঠছে। তাহলে, কী দেখা যাচ্ছে? তাঁদের এই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ে উঠে শেষপর্যন্ত কী লড়াই পরিচালনা করবে? না, এত ঢাকঢোল পিটিয়ে যে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের তত্ত্ব তাঁরা দাঁড় করালেন এবং যুক্তফ্রন্ট ভাঙার রাস্তা প্রশস্ত করলেন, সেই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ে উঠে শেষপর্যন্ত পরবর্তী নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালনা করবে। অদ্ভুত তাঁদের পলিটব্যুরোর সদস্যদের এবং তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের বিশ্লেষণ! দলের নেতা থেকে কর্মী পর্যন্ত কেউই সেদিন নেতৃত্বের এই অদ্ভুত বিশ্লেষণের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করলেন না। এ এক বিচিত্র দল, বিচিত্র তার নেতৃত্ব, বিচিত্র তার সমর্থকবৃন্দ! দলের অভ্যন্তরে এ নিয়ে গুরুতর আলোচনা তো হলই না, যেটা সেদিন অত্যন্ত জরুরি ছিল, উপরন্তু, আমরা সেদিন যখন এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলাম, আমাদের সেই আলোচনায় কর্ণপাত করা তো দূরের কথা, বরং 'জোতদারের দালাল', 'কংগ্রেসের দালাল', 'শ্রেণী শত্রু' প্রভৃতি বলে ব্যুয়িং (অবজ্ঞাসূচক আওয়াজ) করে আমাদের বসিয়ে দেওয়া হল। কারণ, একবার যদি যুক্তিবিচারের মন, তর্কাতর্কি, আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন দলের সঙ্গে মত বিনিময়, সহনশীলতার সঙ্গে অপরের কথাবার্তা শোনার মনোভাব মেরে দেওয়া যায়, তাহলে যে কোনও ব্র্যান্ড-এর জিনিস সহজেই চালানো যায়।

এখানে সত্যিকারের দল বিচারের আর একটি লেনিনীয় পদ্ধতি আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। লেনিনের একটা বড় কথা যে, ভুল একটা পার্টি করতে পারে, কিন্তু, সেটাই একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল যার ভুল স্বীকারের সাহস আছে, যার চরিত্র এমন যে ভুল করার পর ভুল বোঝার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ জনগণের সামনে খোলাখুলি তার ভুলগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং তা সংশোধন করে। তাহলে, একথা তো ঠিক যে, সি পি আই (এম) নেতৃত্ব বর্তমানে সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে, এমনকী এস ইউ সি আই-এর মতো দল যেটা তাদের মতে একেবারে অচ্ছুৎ, তার সঙ্গেও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের স্লোগান তুলছেন। তাই যদি হয়, তাহলে তো তাঁদের বলতে হবে যে, তাঁদের আগের ঐ শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের তত্ত্বটা ঠিক ছিল, না ভুল ছিল? আর, যদি সেটা ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কী ধরনের ভুল হয়েছিল এবং কেন হয়েছিল, তা তো ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, সি পি আই (এম) নেতারা এই সেদিন সিন্ডিকেট কংগ্রেস সহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থী চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিপদ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এবং তাকে রোখার জন্য পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে সর্বরকমে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন এবং ইন্দিরাকে গদিতে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন বলে গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। এবং এই গ্রেটার মিনেস-কে রোখবার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের একাংশের সঙ্গে কান্‌ট্রিওয়াইড ব্রড-বেস্‌ড ফ্রন্ট (দেশব্যাপী বৃহত্তর ফ্রন্ট) গড়ে তোলার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। তাঁরা যদি চান এগুলো আমি পিপল্‌স ডেমোক্রেসির তারিখ সংখ্যা দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি। অথচ, কী অদ্ভুত দেখুন! সেই সি পি আই (এম) নেতারাই আজকে আবার বলছেন, সেই ইন্দিরা কংগ্রেসের মিনেসকেই রোখবার জন্য সিন্ডিকেট কংগ্রেসের সঙ্গে যদিও তাঁরা ফ্রন্ট করতে পারেন না, কারণ, ওরা প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা চলতে পারে! এমনকী, ইস্যুর ভিত্তিতে কখনও কিছু হতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে! তাহলে, তাঁদের এই কথার যা মানে দাঁড়াচ্ছে, তা হচ্ছে, সিন্ডিকেট কংগ্রেস আজ আর তাঁদের মতে এত অচ্ছুৎ নয় এবং বিপজ্জনকও নয়, যাদের সঙ্গে আজকে তাঁদের অন্তত আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। তাহলে সি পি আই (এম)-এর ইন্দিরা কংগ্রেস ও সিন্ডিকেট কংগ্রেস সম্বন্ধে অতীতের বিশ্লেষণটা ভুল ছিল, না সঠিক ছিল, সে সম্বন্ধে তো

তাঁদের কিছু বলতে হবে। কিন্তু, সে ব্যাপারেও একেবারে চুপচাপ। ভাবখানা এমন যে, ওসব কথা কোনদিন বলেনইনি।

তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আজ যখন তাঁরা আবার বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা বলছেন, অর্থাৎ পুরনো যুক্তফ্রন্ট-এর মতোই ফ্রন্ট গঠনের স্লোগান দিচ্ছেন, তখন আগে যে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের কথা, 'নতুন শক্তির অভ্যুদয়ে'র কথা তাঁরা বলেছিলেন তার মধ্যে কী কী অমার্কসীয় বিচ্যুতি ছিল, তাঁদের কোনও একটা রাজনৈতিক দলিলে তার তো একটা ধারাবাহিক আত্মসমালোচনা হবে? সেটাও ঠিক ছিল, আবার এটাও ঠিক — এ তো হতে পারে না। আর, যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে যে মারাত্মক ভুলের এত বড় পরিণতি হল সে সম্বন্ধে কোথায় তাঁরা র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল, ক্লাস এবং জনসাধারণকে জড়িত করে লেনিনের নীতি অনুযায়ী খোলাখুলি সমালোচনা বা আত্মসমালোচনা করেছেন? আর, তা যদি না করে থাকেন, তাহলে তাঁরা কেমন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল? বরং, দেখা যাচ্ছে, তাঁদের কায়দাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। যদি পারা যায়, সাততাড়াতাড়ি ঐ শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের ওপর যেসব দলিলগুলি ছিল সেগুলি নষ্ট করে ফেলা, যাতে আর কেউ খুঁজে না পায়। তারপর কিছুদিন বাদে এমন ভাব দেবেন যে, তাঁরা ওসব বলেননি এবং আমরা যেগুলি বলছি সেগুলি মিথ্যা কথা, তাঁদের বিরুদ্ধে 'স্ল্যান্ডার'। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যুক্ত আন্দোলন যখন আবার ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে যাচ্ছে তখন পুরনো ভুলের যাতে কোনওরূপ রকমফের করেও পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য এই সমালোচনাগুলি আজ প্রয়োজন। এবং এটা এখনই করা সবচেয়ে বেশি দরকার বলে আমি মনে করি। এবং আমরা যেভাবে তাঁদের ভুলগুলো বিশ্লেষণ করে করে দেখিয়েছি, এইভাবেই আমাদের বক্তব্য ধরে ধরে ওঁরা যদি আমাদের নীতি ও বক্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করে আমাদের ত্রুটি দেখিয়ে দেন, আমি মাথা পেতে তা গ্রহণ করব। আমি বিরক্ত হব না, গালাগালিও মনে করব না। কিন্তু, আমি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছি যে, কোনওরূপ সমালোচনা করলেই তাঁরা তাকে গালাগালি বলে মনে করেন। গালাগালি আর সমালোচনার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, এটা তাঁদের বোঝা উচিত।

আমি তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্ববিরোধিতা নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা করেছি। আমি দেখিয়েছি, কীভাবে নকশালপন্থীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে তাঁরা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথা স্বীকার করেছেন। প্ল্যানিং সংক্রান্ত প্রবন্ধে বি টি রণদিভে, ভেগ (অস্পষ্ট) ভাবে বললেও, পুঁজিপতিশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের কথাও বলেছেন, যদিও আমি জানি, ক্যাজুয়ালি (গুরুত্ব না দিয়ে) বলেছেন। এবং সর্বশেষ তাঁদের মজফ্ফরপুর দলিলে কৃষিতে 'ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ' ঘটেছে বলে তাঁরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। অথচ, এইসব বলার এবং প্রস্তাব গ্রহণ করার পরও তাঁরা ভারতবর্ষের বিপ্লবকে 'সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই ধরনের স্ববিরোধিতা তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটছে কেন? কারণ, বাস্তব সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তাঁদের কতকগুলো সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য করছে। কিন্তু, সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার জন্য এই সত্যগুলোকে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে লজিক্যাল কনক্লুশন-এ (যুক্তিসম্মত পরিণতিতে) পৌঁছুতে পারছেন না। ফলে, তাঁরা বিদেশ থেকে কপি (নকল) করা যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বটি দেশের বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে তার ঘাড়ের ওপর চাপিয়েছেন সে বিপ্লব কোনওদিন এদেশে কোথাও ঘটবে না। কোনওদিন ঘটতে পারে না। কারোরই করতে হবে না। তাঁরা যে বিপ্লবের কথা ভাবছেন এবং সে সম্পর্কে মাঠে-ময়দানে গরম গরম বক্তৃতা করছেন সে বিপ্লবের কার্যত একটাই মানে দাঁড়াতে পারে, তা হচ্ছে, যে কোনও একটা প্রতিপক্ষকে বিপ্লবের বিরোধী শক্তির সিম্বল হিসাবে খাড়া করে বিপ্লবটা সেখানেই শেষ করা। অথবা, গরম গরম বিপ্লবী বুলির আড়ালে সংসদীয় রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যেই ঘুরপাক খাওয়া। এদেশে এর দ্বারা যথার্থ বিপ্লব হতে পারে না। ফলে, এমন একটা দল, যারা মূলত ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়নি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়নি, তাদের নেতৃত্বে এদেশে বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে না এবং যুক্ত আন্দোলনগুলিও তার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ভারতবর্ষ পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশ হলেও এখানে একচেটে পুঁজিবাদ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুঁজি ও ব্যাঙ্কিং পুঁজির মার্জার (মিলন)-এর মধ্য দিয়ে ফিন্যান্সিয়াল অলিগার্কির জন্ম হয়েছে। এই ঘটনাটিকে কোনও অজুহাতেই অস্বীকার করা চলে না। শুধু তাই নয়, একচেটে পুঁজির মাধ্যমে এই ফিন্যান্সিয়াল অলিগার্কির জন্ম হওয়া এবং এক্সপোর্ট অব ক্যাপিটাল (পুঁজি রপ্তানি) যা কমোডিটি এক্সপোর্ট

(পণ্য রপ্তানি) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির — এ সবের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যগুলির লক্ষণ ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট। হতে পারে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় এখনও এ অত্যন্ত দুর্বল, কিন্তু, তুলনামূলক বিচারে অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশ হলেও সাম্রাজ্যবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি এর ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে — একথা যাঁরা একচেটে পুঁজিবাদের চরিত্র বোঝেন, ফিন্যান্স ক্যাপিটাল-এর চরিত্র যাঁরা বোঝেন, যাঁরা লগ্নিপুঁজির কারবার বোঝেন এবং আধুনিককালে বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কিং অপারেশন-এর চরিত্র বোঝেন, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের লেনিনীয় ব্যাখ্যা জানেন, তাঁদের অস্বীকার করার উপায় নেই। যাঁরা ভারতবর্ষের শিল্প পুঁজিকেও দালাল পুঁজি বলছেন (যেমন নকশালপন্থীরা), অথবা, যাঁরা সুবিধামতো একবার বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদের কোলাবরেটর (সহযোগী) বলে আখ্যা দিচ্ছেন, আবার সাথে সাথে এই বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার সমস্ত প্রশ্নেই তাদের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছেন,* তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, দালাল পুঁজি তা সে যত শক্তিশালীই হোক, আর একচেটে পুঁজির চরিত্র এক নয়। সি পি আই (এম) রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর যে কথা বলছেন সেটাও এই জন্যই ফাঁকির কথা। তাঁরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ এবং পুরনো গ্রামীণ ভূস্বামীদের গ্রামীণ পুঁজিপতিতে রূপান্তরের কথা স্বীকার করেও ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, এটা বুর্জোয়া ল্যান্ডলর্ড স্টেট হেডেড বাই বিগ বুর্জোয়া। তাঁরা এত সব বলার পরেও যখন রাষ্ট্রের চরিত্রকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন তখন তার একটাই মানে শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াতে পারে। তা হচ্ছে, আধুনিক কোনও বুর্জোয়ার, ধরা যাক টাটার প্রপিতামহ বা তস্য পিতামহ, যদি খুঁজে বের করা যায় যে, ল্যান্ডলর্ড (জমিদার) ছিলেন, তাহলে, এটা বুর্জোয়া-ল্যান্ডলর্ড স্টেট। কারণ, টাটার রক্তে ল্যান্ডলর্ডিজম্ (জমিদারতন্ত্র) মিশে আছে। ফলে, এটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র বা আধুনিক ধরনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয়। তাই আমি বলছিলাম, আসল সমস্যা মোকাবিলা করতে অক্ষম হওয়ার ফলে হেডেড বাই বিগ বুর্জোয়া কথাটার আড়ালে তাঁরা সত্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। নাহলে, এই যে বৃহৎ বুর্জোয়াদের কথা তাঁরা বলছেন, এই কথার দ্বারা তাঁরা কী বোঝাতে চাইছেন? এই বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী মানেই তো আমাদের দেশে বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল বুর্জোয়া, অর্থাৎ একচেটে পুঁজিপতি। এখন, এই একচেটে পুঁজিপতিরা তো আকাশ থেকে পড়ে না। তাহলে, একচেটে পুঁজিবাদের জন্ম হয় কোথা থেকে? একচেটে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার মার্কসবাদী ব্যাখ্যা কী? জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই ধীরে ধীরে একচেটে পুঁজিবাদের জন্ম দিয়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী হয়ে পড়ে, সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়ে, কস্‌মোপলিটান হয়ে পড়ে। এই তো আমি মার্কসবাদ শিখেছি লেনিন থেকে। জানিনা এইসব বড় বড় মার্কসবাদীরা কী বলেন। তাহলে, ভারতবর্ষে এই বৃহৎ বুর্জোয়া কথার দ্বারা তাঁরা একচেটে পুঁজিবাদকেই বোঝাতে চাইছেন। তাহলে, একবার বলবেন, একচেটে পুঁজিবাদ, আবার বলবেন বৃহৎ বুর্জোয়া — মানে, এর কোনও মাথামুণ্ডু নেই। যদি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী একচেটে পুঁজিপতিরা হয়, তাহলে তো বলতেই হবে যে, জাতীয় পুঁজির শুধু জন্ম হয়েছে তাই নয়, জাতীয় পুঁজিপতিরাই বিকাশের পথে ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে কস্‌মোপলিটান হয়েছে। তাহলে, এমন দল যারা ভারতবর্ষের অবস্থাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তারা কী করে বিপ্লব করবে? তাই বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে গণআন্দোলনগুলি ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করে প্রবল বেগে গড়ে উঠতে থাকলেও সেগুলির উপর এরূপ একটি অবিপ্লবী দলের নেতৃত্ব কায়েম থাকার ফলে এত কোরবানি, এত লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ সত্ত্বেও এই যুক্ত গণআন্দোলনগুলি তার স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি।

যুক্ত আন্দোলনে অবিপ্লবী দল সঠিক নেতৃত্ব দিতে অক্ষম

ফলে, পুনরায় কংগ্রেস সম্পর্কে যখন মানুষের মোহমুক্তি ঘটতে চলেছে, সেই মোহমুক্তি ঘটার সময়েই আমি এসব আলোচনাগুলোকে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছি। আমি বলতে চাইছি যে, মূল শ্রেণীশত্রু বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তার দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আজও এককভাবে কোনও দলেরই লড়াই সংগঠিত করার ক্ষমতা নেই। ফলে, ইস্যুর ভিত্তিতে হোক, অথবা নিম্নতম কতকগুলি কর্মসূচির ভিত্তিতে হোক, সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। কিন্তু, এই যে সংঘবদ্ধ লড়াই পুনরায় গড়ে উঠবে, সেই লড়াইতে নেতৃত্বের প্রশ্নটি

---

* যেমন সি পি আই (এম)। তাদের প্রোগ্রাম দ্রষ্টব্য — প্রকাশক

অত্যন্ত গুরুতর। জনসাধারণ চান বা না চান, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যে দলটা শক্তিশালী, বাস্তবে সেই দলটাই নেতৃত্ব দেয়। তারই প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ তাকে শক্তিশালী দেখার ফলে তাকে আরও শক্তিশালী করে। কারণ, তারা মনে করে, দলটা যেহেতু শক্তিশালী তাই সেই কিছু করতে পারবে। কিন্তু, সে দল যদি অবিপ্লবী দল হয়, তার রাস্তা যদি ভুল হয়, তার বিপ্লবের তত্ত্ব যদি ভুল হয়, তাহলে বিপ্লব-বিপ্লব খেলায় সমস্ত জনগণের কোরবানি, কর্মীদের আত্মত্যাগ হেলায় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে প্রতিক্রিয়া আবার শক্তিশালী হয়। কাজেই একটা ভুল রাজনৈতিক দল — নীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি, রুচি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ — সমস্ত দিক থেকে ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যাবে, যার মধ্যে ক্ষয় ধরে গিয়েছে, ক্ষয়িষ্ণু, আজও বড় দল বলে যদি তেমন দলেরই আপনারা পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহলে সেই বড় দল আন্দোলনকে বিপথগামী করবেই, এবং সর্বনাশ আরও বেশি হবে। একটা দল বড় কি ছোট, এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঠিকই। কিন্তু, তার চেয়েও একটা বড় প্রশ্ন রয়েছে, তা হচ্ছে দলের রাজনীতিটা ঠিক কি না, দলের চরিত্রটা ঠিক কি না, এবং দলটা সত্যিকারের বিপ্লবী দল কি না।

সঠিক বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করুন

যদি সঠিক বিপ্লবী দল দেশে না থেকে থাকে, তাহলে এই সম্মিলিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই দল নতুন করে গড়ে তোলার স্লোগান তুলতে হবে, এবং যত কষ্টসাধ্যই হোক, সেই দল নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। আর, যদি সঠিক দল দেশে থেকে থাকে, যদি রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সবদিক বিচার করে দেখা যায় যে, সে দলটা এস ইউ সি আই, সেক্ষেত্রে সি পি আই (এম)-এর তুলনায় এস ইউ সি আই আজ যদি অনেক ছোট দল হয়ে থাকে, তাহলে এই সম্মিলিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দ্রুত এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করতে হবে। কারণ, শক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটা ভাল আদর্শ, একটা ভাল মতবাদ, একটা ভাল পরিকল্পনা শুধু মাথায় থাকলে, আদর্শের মধ্যেই সীমিত থাকলে, তার দ্বারা কাজ হয় না। সেই আদর্শকে, মতবাদকে, পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করতে হলে শক্তি তার চাই, এস ইউ সি আই-এর মতবাদ, চরিত্র, আদর্শ বিপ্লবী হলেও যুক্ত আন্দোলনগুলোর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সাংগঠনিক শক্তি সে আজও অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে, যুক্ত গণআন্দোলনগুলির স্বার্থেই তাই এস ইউ সি আই-এর শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো আজ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ, যুক্ত আন্দোলন চালাবার সাথে সাথে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্যে সহনশীলতার মনোভাব নিয়ে কীভাবে যুক্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব, সম্মিলিত আন্দোলনের দ্বন্দ্ব এবং ঐক্যের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাদের যথার্থ ধারণা আছে তারাই একমাত্র এই দুরূহ কাজটি করতে পারে। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙবার সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে ঐক্য রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত চিঠি ও প্রস্তাবগুলি নিয়ে আমরা বিভিন্ন দলগুলোর দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলাম এবং জনসাধারণকেও লিখিতভাবে যে প্রস্তাবের কথা আমরা জানিয়েছিলাম, সেসব কথা যাদের মনে আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, সেদিন ঐক্য রক্ষার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শক্তির অভাবের জন্য আমরা তা করতে পারিনি। কারণ, শক্তি কম বলেই সেদিন আমাদের কথার গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে বলে কেউ বোধ করেনি। ফলে, ভবিষ্যতে যে ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে উঠতে যাচ্ছে, সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যাতে রক্ষা করা যায় এবং তাকে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য যুক্তআন্দোলনগুলো গড়ে তোলার সাথে সাথে আমাদের দলকে শক্তিশালী দল হিসাবে গড়ে উঠতে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। আমাদের হাতে শক্তি জোগান। এই আবেদন করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৩ এস ইউ সি আই-এর
প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার
শহীদ মিনার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৩ সালের ৩০শে মে
প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।